রাগ বসন্ত

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

সুখি এসে বলল, ভাই, একটা মেয়ে তোকে ডাকছে। বারান্দায় বেসিনের আয়নায় নিজের মুখখানা দেখছিলো রঞ্জু। দু'দিন দাড়ি কাটা হয়নি। আজও দাড়ি কাটতে ইচ্ছে করছে না, এরকম মাঝে মাঝেই হয়। একেই বলে আলস্য। একটানা দশ-বারো দিন দাড়ি না কেটেও দেখেছে রঞ্জু, তখন রীতিমতো জেলখানার কয়েদিদের মতো দেখতে লাগে তাকে। অবশ্য তাতে রঞ্জুর কিছু এসে-যায় না। কোনো প্রেমিকাও নেই যে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে। বড়দির চোখে পড়লে হয় তো এক-আধবার বলে, কী জঘন্য লাগছে তোকে! একেবারে চোর-ডাকাতের মতো দেখতে হয়েছিস! দাড়ি কাটার কথাটা কখনো সরাসরি বলে না বড়দি।

আদ্যিকালের আয়না, পারা নষ্ট হয়ে গেছে এখানে-ওখানে, অভ্যাস না থাকলে এ আয়নায় কারও পক্ষে মুখ দেখা সম্ভব নয়। কেন কে জানে এটা পাল্টানোর কথাও কারো কোনো দিন মনে হয়নি।

সুখি রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছিলো, হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেট। বোধহয় টুকিটাকি কিনতে মুদিখানায় গিয়েছিলো। বড়দি সংসার খরচের টাকা ওর হাতেই দিয়ে যায় অফিসে বেরোবার আগে। এ বাড়িতে কাঁচাবাজারটুকু ছাড়া আর কোনো কাজেই রঞ্জুকে প্রয়োজন হয় না দুই দিদির। এমনকি টেলিফোন বা ইলেকট্রিক বিলও সুখি নিজেই দিয়ে আসে। প্রতিভার এত সময় নেই।

ইচ্ছে করেই প্রতিভা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘুম থেকে ওঠে রঞ্জু। সে সহজে বড়দির মুখোমুখি হতে চায় না।

এখন বেলা দশটা, চা-জল খাবার খেয়ে সে বেরোতে যাচ্ছিলো, আসলে সুখি ঘরে ছিলো না বলে একটু অপেক্ষা করছিলো। একটা মেয়ে তাকে ডাকছে শুনে একটু অবাকই হয়েছে রঞ্জু।

বারান্দার শেষ প্রান্তে রান্নাঘর, সুখি সেখানে কি খুটখাট করছিলো, রঞ্জু চেঁচিয়ে বলল, মেয়েটা কে রে, ছোড়দি? চেনা?

বাসস্টপে দু'একবার দেখেছি, এপাড়ায় বোধহয় নতুন।

ভেতরে এসে বসতে বললি না কেনো?

বলেছিলাম। এলো না।

এ পাড়ায় আবার নতুন কোনো ফ্যামিলি এলো– ভুরু কুঁচকে কয়েক মহূর্ত ভাবল রঞ্জু। কারো কথাই মনে পড়লো না। চারদিকের পুরনো বাড়িগুলো ভেঙে নতুন নতুন সব মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। ক'বছরের মধ্যে পাড়াটার চেহারাই পাল্টে গেছে। কোন ফ্ল্যাটে কে কখন আসছে জানাও যায় না সব সময়। রঞ্জুদের সাবেকি আমলের বাড়িটার ওপরেও কিছুদিন হল নজর পড়েছে এক প্রমোটারের। রঞ্জুর কাছে মাঝে-মাঝেই আসে প্রমোটারের লোক, তবে প্রতিভার কানে এখনো কথাটা তোলা যায়নি। তুলেও কোনো লাভ হবে না, বড়দি কিছুতেই রাজি হবে না। রঞ্জু জানে। লোকটার নাম কৃষ্ণদয়াল, প্রায় এঁটুলির মতো লেগে আছে তবু।

চারদিকের বড় বড় ফ্ল্যাটগুলোর আড়ালে রঞ্জুদের সাবেকি বাড়ি প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে। সরু একটা গলি দিয়ে বড় পিচ রাস্তায় পড়তে হয়।

সদর খুলেই রঞ্জু দেখল মেয়েটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ রাতের দিকে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিলো, রাস্তা এখনও ভিজে। মোড়ের কদম গাছটায় এবার ফুল ফুটেছে অনেক, পথের ওপর কদমের গুঁড়ো-গুঁড়ো পাপড়ি পড়ে আছে। হাওয়ায় কদম ফুলের গন্ধ। আকাশে এখন মেঘ নেই, রোদে ধুয়ে যাচ্ছে চারদিক।

হলদে রঙের চুড়িদার পরা মেয়েটিকে সুন্দরীই বলতে হবে। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় একটু বেশিই লম্বা, গায়ের রঙ ঠিক ফর্সা বললেও সবটুকু বলা হয় না, কেমন একটা সোনালি আভা আছে যেনো, চুল ছোট করে ছাঁটা, কিছুটা খয়েরি, লম্বা টানা চোখের মণি দু'টি কটা। অনেকটা যেনো পাঞ্জাবি মেয়েদের মতো দেখতে। সুন্দরী, কিন্তু কোথায় যেন একটু রুক্ষতা লুকোনো আছে সেই সৌন্দর্যের ভেতরে। বয়স কুড়ি-একুশ হবে।

রঞ্জুকে সদর খুলে বেরোতে দেখে চোখ তুলল মেয়েটি, এগিয়ে এসে বেশ স্মার্টলি বলল, আমার নাম ঋতু রায়, নির্মলদা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে... আপনি কি রঞ্জন ভট্টাচার্য?

সকাল বেলায় এরকম সুন্দরী একটি মেয়ের মুখে নির্মল সেনগুপ্তর নাম শুনে ভুরু দু'টি আপনা থেকেই কুঁচকে উঠল রঞ্জুর। বাসস্টপে, রাস্তার ওপারে নির্মলদার জেরক্স আর এসটিডিআইএসডি বুথ, সম্প্রতি আবার একটা সাইবার ক্যাফেও খুলেছে। পার্টির লোক, কী ধান্ধায় মেয়েটাকে পাঠিয়েছে কে জানে?

অন্যমনস্ক গলায় রঞ্জু বলল, হ্যাঁ। বলুন।

ঋতু ব্যাগ থেকে দু'টো জেরক্স করা কাগজ বের করে মিষ্টি করে হাসলো, বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল, এই কাগজ দু'টো আপনাকে দিতে বললেন নির্মলদা।

রঞ্জু কাগজ দু'টো ভালো করে দেখলও না, ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। নির্মলদার কথাই ভাবছিলো সে, এই মেয়েটা গিয়ে তার পাল্লায় পড়লো কী করে?

ঋতু বলল, মাস দুয়েক হলো আমরা এ পাড়ায় এসেছি, আসার পরপরই টেলিফোনটা ট্রান্সফার করার জন্য একটা দরখাস্ত করা হয়েছিলো, এখনো কিছুই হয়নি তাই...

নির্মল সেনগুপ্ত যখন পাঠিয়েছেন তখন ব্যাপারটা যে এরকমই কিছু একটা হবে সেটা আগেই আঁচ করেছিলো রঞ্জু। সকাল বেলায় সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে মনটা কোথায় ফুরফুরে হয়ে যাবে তা নয়, উল্টো নির্মলদার কথা ভেবে মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। পার্টির লোক, তাকে খেপানোও যায় না। আজ তিন বছর বিএ পাস করে ঘরে বসে আছে রঞ্জু। চাকরি-বাকরি সব এখন নির্মলদাদের পার্টির হাতে, সুতরাং আর একটা ঝামেলা মাথায় নিতেই হচ্ছে।

রঞ্জুকে চুপ করে থাকতে দেখে ঋতুর বোধহয় একটু অস্বস্তি হচ্ছে। ইতস্তত করে বলে, আপনাকে একটু ট্রাবল দিলাম।

না না, ট্রাবল আর কি! আমি দেখছি কি করা যায়।

কথাটা বলে ভেতরে ভেতরে নিজেরই হাসি পেয়ে যাচ্ছিল রঞ্জুর। কথাটা এমনভাবে বলা হয়ে গেলো যেন সে নিজেই টেলিফোন ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা। পুঁচকে মেয়েটাকে আপনি-আজ্ঞে করতে খারাপই লাগছে এখন। ইচ্ছে করেই রঞ্জু বলল, তোমরা কি নতুন ফ্ল্যাট কিনছ এ পাড়ায়?

ওরা গলি ধরে এগোচ্ছিলো বড় রাস্তার দিকে। বড় রাস্তায় পড়ে ডানদিকে এগোলেই বাসস্টপ। গলির পথটায় এখানে-ওখানে গর্ত, তাতে বৃষ্টির জল জমে আছে।

ঋতু বলল, না, আমরা ভাড়াবাড়িতে এসেছি। পোস্ট-অফিসের দিকটায়, একটা পুকুর আছে, তার কাছে। দেবু মল্লিকের বাড়ি।

রঞ্জুর মনে পড়লো দেবু মল্লিকের বাড়িটা অনেকদিনই ফাঁকা পড়েছিলো। দেবুদা থাকতেন দোতলায়, একতলায় এক খিটকেল ভাড়াটে ছিলো অনেকদিন। সেই ভাড়াটের যন্ত্রণাতেই কিনা কে জানে দেবুদা ভবানীপুরের দিকে ফ্ল্যাট কিনে উঠে গেছেন বছর দুয়েক আগে। তারপর সেই ভাড়াটের কি সুমতি হল, সেও সরকারি ফ্ল্যাটে উঠে গেল কসবার দিকে। মাঝখানে শোনা গিয়েছিল বাড়িটা প্রমোটারকে দিয়ে দেবেন দেবুদা। শেষ পর্যন্ত সেই ভাড়াটেই বসালেন!

মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে হেভি হাইফাই ফ্যামিলি হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, পাড়ায় এরকম চুমকি একটা মেয়ে এলো রঞ্জু জানতেই পারলো না– এটা সম্ভব হলো কি করে? বুনো, সুভাষ– কই, এরাও তো তাকে কোনো দিন কিছু বলেনি!

বাসস্টপ পর্যন্ত ঋতু আর কোনো কথা বলল না। বাসস্টপের ছাউনির নিচে পাড়ারই মুখচেনা ক'জন অফিসযাত্রী দাঁড়িয়ে, ওদের দিকে না তাকিয়েও রঞ্জু বুঝতে পারে আড়চোখে ওরা সকলেই রঞ্জুকে এখন দেখছে। কোনো কারণ নেই, হঠাৎই একটা প্রবল রাগ ভেতরে পাকিয়ে উঠছিলো। বাসস্টপের মুখগুলোর ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রঞ্জু, সকলেই উদাসীন মুখ করে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু রঞ্জু জানে ওই সুখী গৃহস্থ মানুষগুলোর অপরিসীম কৌতূহল এখন তাকে ঘিরেই। পাড়ায় রঞ্জুর যে খুব সুনাম নেই সে খুব ভালো করেই জানে। পাসকরা বেকার ছেলেদের কোনো পাড়াতেই সুনাম থাকে না। রঞ্জু যে ক্লাবের সদস্য সেই 'সবুজ সংঘ' ক্লাবটাকেও পাড়ার তথাকথিত ভদ্রলোকরা এড়িয়ে চলে। অথচ ওরা যে খুব গুরুতর সব অপরাধ করে বেড়াচ্ছে তাও নয়। এখন এই যে সে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে– এর মধ্যে কৌতূহলের কী ব্যাপার আছে? রঞ্জুর কি প্রেমে পড়ার যোগ্যতাও নেই?

প্রেম শব্দটা মাথায় আসতেই ঋতুর দিকে তাকালো রঞ্জু। একটা পাবলিক বাস এসে দাঁড়ালো, কণ্ডাক্টরের হাঁকাহাঁকিতেও কেউ উঠল না। লোকগুলোকে শোনানোর জন্যই সে বলল, ঋতু, তুমি কোন দিকে যাবে?

এতো আন্তরিকভাবে কথা বলতে দেখে ঋতু বোধহয় একটু অবাকই হয়, বলে, আমি সাউথ সিটিতে পড়ি। একবার কলেজের দিকে যেতে হবে।

একটা অটো এসে দাঁড়াতেই ঋতু ব্যাগ সামলে ড্রাইভারের বাঁ-দিকে বসে পড়লো। হাত নেড়ে রঞ্জু বলল, ঠিক

আছে, আমি দু'চারদিনের মধ্যেই দেখছি কি করা যায়!

অটোটা বেরিয়ে যেতে আর এক পলক বাসস্টপের মুখগুলো দেখে নিয়ে রাস্তা ক্রস করলো রঞ্জু। খানিকটা এগিয়ে গেলেই নির্মলদার সাইবার ক্যাফে। অগাস্ট শেষ হতে চলল, এখনো হাওয়ায় শরতের ছোঁয়া নেই। একটু আগেও কী তেজি রোদ ছিলো, আকাশ ছিলো নীল, এরই মধ্যে কখন যে ঘন কালো প্রকাণ্ড এক মেঘখণ্ডের আড়ালে চলে গেছে সূর্য খেয়ালই করেনি সে। বর্ষা এবার সহজে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। দু'একটা ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে এরই মধ্যে।

পা চালিয়ে সাইবার ক্যাফে এসে রঞ্জু দেখলো কাচের চৌখুপিতে বসে কি সব হিসেব-নিকেশ করছে নির্মলদা, মুখখানা গম্ভীর। বড় ঘরটায় সার দিয়ে আটখানা কম্পিউটার মনিটর, একটা বাদে আর সবগুলোই ফাঁকা। ষোল-সতেরো বছর বয়সের একটি বারমুডা পরা ছেলে, বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, বসে বসে বোধহয় চ্যাট করছে। একধারে জেরক্স মেশিনে বসে কাজ করছে, ঢাউস একটা বই জেরক্স করছে বোধহয়। রঞ্জুকে ঢুকতে দেখে চোখের ইশারায় কি একটা কথা বলতে চাইল, রঞ্জু ঠিক বুঝতে পারল না।

কাচের দরজাটা ঠেলে চৌখুপিতে ঢোকে রঞ্জু, চোখ না তুলেই নির্মল বলে, বোস।

গদিআঁটা চেয়ারটায় বসে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দেয় রঞ্জু। ভেতরটায় এসি চলছে বিনবিন করে। শরীরের ঘাম শুকিয়ে আসছিলো। নির্মল ক্যালকুলেটর টিপে হিসাব ধরেই চলেছে, ইচ্ছে করেই পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফোঁস করে ধরালো রঞ্জু। ক্যালকুলেটরের বাটনে আঙুল থেমে গেছে নির্মলের। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলল, কতবার তোকে বারণ করেছি এসিতে স্মোক করতে!

রঞ্জু কথাটাকে আমলই দিলো না। চেয়ারে মাথাটাকে পেছন দিক হিলেয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, গুরু, আজকে যে হেভি দেখতে মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলে আমার কাছে, কে?

ঋতু গিয়েছিল তোর কাছে?

হ্যাঁ।

তুই কি বললি?

সিগারেটে ঘনঘন কয়েকটা টান দিয়ে টেবিলে অ্যাশট্রে খুঁজছিল রঞ্জু, না পেয়ে শেষ হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে চটি দিয়ে মাড়িয়ে দিলো। চোখ সরু করে নির্মলের মুখখানা দেখছিলো সে, কোঁচকানো ভুরু দু'টি সোজা হয়ে এসেছে, ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও যেনো ফুটলো। নির্মলের বয়স পঞ্চাশের ওপরেই হবে। পেটানো শক্তপোক্ত চেহারা। মাথার ঠাসবুনোট ঘন চুলে কলপ পরে প্রতি সপ্তাহে, ফলে বয়স একটু কমই দেখায়।

কী বললাম সেটা না হয় পরেই শুনলে, আগে কেসটা কি বল!

একটু ইতঃস্তত করে নির্মল বলল, কেস কিছু নয়, ওর মা আমার পরিচিত। ভালো গান করেন ভদ্রমহিলা। গতবার আমাদের ব্রহ্মপুরের বিজয়া সম্মিলনীতে ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছিলো পাড়ার ছেলেরা, তখনই আলাপ। তারপর ফোনে কথা হতো মাঝে মাঝে। ঢাকুরিয়ার দিকে থাকতেন ভদ্রমহিলা। মাস কয়েক আগে হঠাৎ একদিন বললেন, ওখানে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কী একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমাদের এদিকটায় চলে আসতে চান।

আর অমনি তুমি গিয়ে দেবু মল্লিককে ধরলে আর দেবু মল্লিক এক কথায় রাজি হয়ে গেলো, এই তো? কৌতুকভরা গলায় রঞ্জু বলল।

মাইরি, সত্যি বলছি, মা কালীর কিরে! দেবুদা অবশ্য এক কথায় রাজি হয়নি, আলফাল অনেক কিছু বলে বার খাইয়ে তবে রাজি করিয়েছি।

তোমার ইন্টারেস্ট?

নির্মল এবার একটু সিরিয়াস হওয়ার চেষ্টা করে বলল, আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। একটা ভালো ফ্যামিলি, প্রবলেমে পড়েছে, সাহায্য করলাম। তাছাড়া ছোট্ট ফ্যামিলি– মা, মেয়ে আর ভদ্রমহিলার এক মামা– মামাটা নাকি এক সময় খুব নামকরা নকশাল নেতা ছিল...সব শুনে দেবুদাও আর আপত্তি করেনি।

বাইরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে তখন, কিন্তু কাচের এই চৌখুপির ভেতর থেকে বৃষ্টির শব্দ ভাল শোনা যাচ্ছে না। বাস-মিনিবাসগুলোর জানালায় কাচ পড়ে গেছে, জল ছিটোতে ছিটোতে বড় রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। নির্মল যে কথাগুলো এইমাত্র বলল তার কতখানি সত্যি, কতখানি মিথ্যে– রঞ্জু তাই নিয়ে ভাবছিল। এসব পার্টি-করা লোকগুলো একটাও সত্যি কথা বলে না, রঞ্জু জানে। তবে ঋতু নামের মেয়েটা যে খুব শিগগিরই পাড়ায় হিট হতে চলেছে সে বিষয়ে রঞ্জু শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত। মেয়েদের ব্যাপারে নির্মল সেনগুপ্তর দুর্বলতার কথা সকলেই জানে, তবে লোকটা এত ধূর্ত এবং সতর্ক যে এখনও ওর বিরুদ্ধে বড় কোনও অভিযোগ তোলা যায়নি।

নির্মল আবার গভীর মনোযোগ দিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিল। ছোট একটা নোটবই-এ কী সব লিখছে ও মাঝে মাঝে, চোখ সরু করে রঞ্জু দেখছিল। রঞ্জু উঠে গেলে এখন সে নিশ্চয়ই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, ভাবতে গিয়ে হাসি পাচ্ছিল রঞ্জুর। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, তুমি মাইরি এসব মেয়েফেয়েদের সঙ্গে আমাকে জুতে না দিলেই পারতে। পার্টির হয়ে পোস্টার মারতে বল, ওয়ালিং করতে বল– আমি আছি, কিন্তু শালার ওই মেয়েদের সঙ্গে আমার ঠিক হয় না!

নির্মল এবার চোখ তুলে রঞ্জুকে মাপছিল। রঞ্জু লম্বায় প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি, একহারা মাসকুলার চেহারা, গায়ের ফর্সা রং পুড়ে এখন তামাটে, একমাথা ঘন কোঁকড়ানো চুল, টিকোলো নাক– এক সময় কানুন-গোপাড়ার দিকে ব্যায়াম করতে যেত রেগুলার, সেটা ওর দেহের ঋজু গড়ন দেখলেই বোঝা যায়। ওর মিশমিশে কালো দু'চোখের মণিতে সব সময়ই কেমন একটা উদাস দৃষ্টি, সম্ভবত এ কারণেই ওকে ঠিক মস্তান-মস্তান দেখায় না।

গম্ভীর মুখেই নির্মল বলল, তুই না চাইলেও মেয়েরা তোকে পছন্দ করে সেকথা তুই জানিস?

এবার আর না হেসে পারল না রঞ্জু, বলল, আর বার খাইও না, গুরু! ঢের হয়েছে! যা একখানা ঝামেলার কাজে জড়িয়ে দিয়েছ না, ভাবতে গেলেই জ্বর আসছে।

তোর না কে একটা ক্যাচ আছে টেলিফোন অফিসে?

ক্যাচ না হাতি! সেবার ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে, গাঙ্গুলিবাগানের দিকে থাকে। পাত্তি না পড়লে ফাইল নড়বে না।

এখন আবার ফাইল কি রে, সব কম্পিউটারাইজড হয়ে গেছে না?

ওই হল, ফাইলের ফিতের বদলে কম্পিউটারের কী-বোর্ড!

ইঙ্গিতটা বুজে নিয়েছে নির্মল। এই ছেলেগুলোর সঙ্গে অনেকদিন ঘর করছে সে। তাছাড়া সামনেই লোকসভার নির্বাচন। এখন এদের একটু সমঝে চলা ছাড়া উপায় নেই। ড্রয়ার খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে নিঃশব্দে এগিয়ে ধরল নির্মল। রঞ্জু নোটটা এক পলক দেখে নিয়ে বলল, হাফ পাত্তিতে আজকাল এক প্যাকেট ভাল সিগারেটও পাওয়া যায় না, গুরু! একটা ফুল পাত্তি ছাড় দেখি চটপট! হেভি মাক্ষিচুষ হয়ে যাচ্ছ মাইরি!

পঞ্চাশ টাকার দ্বিতীয় নোটটা বের করে নির্মল বলল, এবার কেটে পড় তো ভালয় ভালয়!

রঞ্জু উঠছিল! বেরোবার আগে চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল– সেই বারমুডা পরা ছেলেটা এখনও

আপনমনে চ্যাট করেই চলেছে। বুনো এখন আর এদিকে তাকাচ্ছে না, সেই বইটা জেরক্স করা এখনও শেষ হয়নি। এখানে সে নির্মল সেনগুপ্তর কর্মচারী, বন্ধু হলেও এ জায়গায় ওর সঙ্গে কথা বলতে একটু কেমন অস্বস্তি হয় রঞ্জুর।

বাইরে বেরিয়ে দেখল বৃষ্টিটা ধরে এসেছে, তবে পুরো থামেনি এখনও। বৃষ্টির গুঁড়ো ভাসছে বাতাসে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনটা ভাল হয়ে আসছিল। ভিজে হাওয়ায় আবার যেন কদমফুলের গন্ধ পাচ্ছে রঞ্জু। সকালে ঋতু যখন এসেছিল তখনও ঠিক এই গন্ধটাই ভেসে এসেছিল হাওয়ায়।

কিন্তু মনটা এই যে হঠাৎ ফুরফুরে হয়ে গেল সেটা এই দুটো হাফপাত্তি পাওয়া গেছে বলে, নাকি সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখে দিনটা শুরু হল বলে– রঞ্জু ঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

॥ দুই ॥

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিলিরে, ঋতু? সন্দিগ্ধ চোখে নন্দিতা মেয়ের দিকে তাকাল। শোবার ঘরে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঋতু। এখন সকাল দশটা। বাইরে ঝলমলিয়ে রোদ উঠেছে, ঘন নীল আকাশের পটে দু-এক খণ্ড শুভ্র মেঘ ভাসছে। এ বছর আজই প্রথম যেন হাওয়ায় শরতের ছোঁয়া টের পাওয়া যাচ্ছে। কলেজে যাবে বলে নতুন কেনা আকাশি রঙের সালওয়ার-কামিজখানা পরেছে ঋতু, আয়নায় নিজেকে দেখছিল। মায়ের গলা পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

নন্দিতা এই সবে চান করে বেরোল, ভেজা চুল পাট করা হয়নি, শায়া-ব্লাউজের ওপর সস্তা কটনের একটা হাউজকোট চাপানো। তার মানে বাথরুমের ভেতর থেকেই বারান্দার কথোপকথন শোনবার চেষ্টা করছিল। বেশ তাড়াহুড়ো করেই বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, ভেজা চুল ভাল করে মোছাও হয়নি বোধহয়, চুলের ডগা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল মেঝেয় গড়িয়ে পড়ছে।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আয়নার ভেতর দিয়ে আবার মায়ের দিকে তাকাল ঋতু। বাবার সেই ভয়ংকর মৃত্যুর পর থেকে কী এক গভীর শঙ্কা যেন ভেতরে ভেতরে বহন করে চলেছে নন্দিতা। ঋতু ঠিক বুঝতে পারে না। এক এক সময় ঋতুর মনে হয় মৃত অমিতকিরণের ভূত বুঝি সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে নন্দিতাকে। কিন্তু এর কি সত্য কোনও কারণ আছে? বাবার মৃত্যু-দৃশ্যটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে ঋতুর। তখন কত আর বয়স, সাত-আট হবে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখেছিল বাড়িভর্তি মানুষ। বাইরের ঘরের দরজা ভাঙ্গা হচ্ছে, ভিড়ের মধ্যে ঋতুও গিয়ে উঁকি দিয়েছিল একবার। খিল ভাঙার পর দরজা উন্মুক্ত হতেই এক পলক মাত্র দৃশ্যটা দেখেছিল ঋতু। ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষটা ফ্যানের রড থেকে ঝুলছে। পায়ের কাছে ওল্টানো চেয়ার, ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে। তারপর কে একজন তাকে হাত ধরে এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দেশবন্ধু পার্কের কাছে সেই ভাড়াবাড়ির শোবার ঘরে– ঋতুর এখন আর মনে নেই।

বললি না কার সঙ্গে কথা বলছিলি? নন্দিতা আবার বলল।

কার সঙ্গে আবার কথা বলব? পাশের ফ্ল্যাটের সেই বউটা এসেছিল, বলল ওর মেয়ে গান শিখতে চায়।

কাল সন্ধ্যেবেলার ওই একই কথা জানতে এসেছিল আমার কাছে, যা বলবার সব তো কালই বলে দিয়েছি। তুই কী বললি?

আমি আবার কী বলব?

অনেকক্ষণ তো বকবক করতে শুনলাম!

বলেছি সন্ধ্যেবেলায় আসতে। উফ্ তোমাকে নিয়ে আর পারি না! সব সময় এত কান খাড়া করে রাখ কেন?

রাখতে হয়। সব বোঝার বয়স এখনও তোর হয়নি। তাছাড়া নতুন পাড়া.... সেন্টেন্সটা আর কমপ্লিট করল না নন্দিতা, ভুরু কুঁচকে অন্য কী একটা ভাবনার ভেতরে চলে গেল।

মা'র দিকে ঘুরে দাঁড়ায় ঋতু। ভাল করে মায়ের মুখখানা পড়বার চেষ্টা করে। এসব সময় মাকে খুব অচেনা লাগে ঋতুর, মনে হয় সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত এক মহিলা, সন্দেহটা যে কী নিয়ে সেটাও পরিষ্কার নয়। অমিতকিরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর থেকেই রোগটা ধীরে ধীরে নন্দিতাকে গ্রাস করে নিয়েছে। অথচ নিজের আত্মহননের জন্যে যে কেউ দায়ী নয় সেকথা অমিতকিরন স্পষ্ট করে লিখে গিয়েছিল। ভাঁজকরা কাগজটা পুলিশ পেয়েছিল তার পাঞ্জাবির বুকপকেটে। পোস্টমর্টেমেও প্রমাণিত হয়েছিল ব্যাপারটা। পুলিশের মতে, মানসিক অবসাদই মৃত্যুর কারণ। অফিস কলিগরাও সেরকমই বলেছিল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল মানুষটা। ভরদুপুর বেলায় মাঝে-মাঝে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে একা বসে থাকত চুপচাপ।

সেই ভয়ংকর ঘটনাটার মাস ছ'য়েক পরই নন্দিতা দেশ বন্ধু পার্কের বাড়িটা ছেড়ে গ্রে-স্ট্রিটে উঠে এসেছিল মেয়েকে নিয়ে। অমিতকিরনের মৃত্যু যে আত্মহত্যাই সেটা প্রমাণিত হবার পর পাড়ার লোকেরা সম্ভবতঃ ঘটনাটার জন্যে নন্দিতাকেই দায়ী করেছিল এবং ঠারে-ঠোরে সে কথাটা বোধহয় বলবার চেষ্টাও করে থাকবে কেউ কেউ। দেশবন্ধু পার্কের খোলামেলা চমৎকার বাড়িটা ছেড়ে আসার সেটাই একমাত্র কারণ কিনা ঋতু নিশ্চিত নয়। তাছাড়া বাবার বাল্যবন্ধু প্রতাপ কাকুর যাতায়াতও তখন বেড়ে যায়। প্রতাপ কাকু বিয়ে-থা করেননি। থাকতেন কাঁচড়াপাড়ায়। অফিস ফিরতি প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় চলে আসতেন তখন। সেটা নিয়েও কোনও জটিলতা দেখা দিয়েছিল কিনা ঋতু বলতে পারবে না। খুব সুন্দর মানুষ ছিলেন প্রতাপ কাকু। লম্বা, ফর্সা, একহারা নির্মেদ চেহারা। অনেকটা সিনেমার নায়কদের মতো দেখতে। নন্দিতাকে নাম ধরেই ডাকতেন। ঋতুর খুব আবছা মনে পড়ে, ছোটবেলায় দীঘা, পুরী– এসব জায়গায় বেড়াতে গেলে বাবা সব সময়ই প্রতাপ কাকুকে সঙ্গে নিতেন।

গ্রে-স্ট্রিটের বাড়িটা ছিল খুবই ছোট, একতলায় পায়রার খুপড়ির মতো দু'খানা ঘর, কমন বাথরুম। এক বিধবা মহিলা ছিলেন বাড়িওয়ালি, দোতলায় থাকতেন। ছ'সাতখানা বেড়াল নিয়ে তার সংসার। ছেলেপুলে বোধহয় ছিল না ভদ্রমহিলার। বৃদ্ধ এক চাকর ছিল, সে-ই সব দেখাশুনা করত। গ্রে-স্ট্রিটের বাড়িতে থাকার সময়ই নন্দিতা গানের টিউশন শুরু করেছিল। ইনফরমেশনস্ ডিপার্টমেন্টের সামান্য কেরানি ছিলেন অমিতকিরন। ফলে একটা পেনশন জুটেছিল নন্দিতার। তবে সেই সামান্য টাকায় বাড়িভাড়া দিয়ে সংসার চালানো এবং মেয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগানো বোধহয় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল নন্দিতার পক্ষে। তো সেখানেও একদিন প্রতাপ কাকুর আবির্ভাব ঘটল এবং তারপর কেউ বোধহয় এসে বাড়িওয়ালির কান ভাঙিয়ে দিয়ে গেল। মাত্র এক মাসের নোটিসে সে বাড়ি থেকে উঠে যেতে হয়েছিল নন্দিতাকে। এবার নন্দিতা উঠে এল উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায়। ঢাকুরিয়ায়।

ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে দাসপাড়ার বাড়িটা নন্দিতা পেয়েছিল কাগজের অ্যাড দেখে। ঢাকুরিয়া দাসপাড়া বাজারের ওপর দুখানা ঘর, বাথরুম, কিচেন। এখানে এসে আর রিস্ক নেয়নি নন্দিতা। কালনা থেকে প্রণব মামাকে বলে-কয়ে নিয়ে এসেছিল। প্রণব মামারও ত্রিসংসারে কেউ নেই। এক সময় খাদি গ্রামোদ্যগে চাকরি করতেন, ঊনসত্তুর সনে চারু মজুমদারের দলে নাম লিখিয়েছিলেন। চাকরি ছেড়ে বিপ্লব করার জন্যে গ্রামে চলে গেলেন। তিয়াত্তর সনে বলাগড়ে ধরা পড়লেন। তারপর অনেকদিন তার খবর কেউ জানত না, সাতাত্তরে জেল থেকে বেরোলেন। ততদিনে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, মাথায়ও একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। কালনায় ভায়েদের সংসারেই ছিলেন, নন্দিতা একরকম জোর করেই তাকে এনে তুলল ঢাকুরিয়ার ভাড়াবাড়িতে।

ক'টা বছর ভালই কাটছিল নন্দিতার। বাড়িতেই গানের স্কুল করেছিল, ছাত্রীসংখ্যা খারাপ ছিল না। পাড়ার ফাংশনে গান করে একটু নামও হয়েছিল। দু'একটা গানের প্রোগ্রামও পাওয়া যাচ্ছে, ক্লাবের ছেলেরা সস্তায় একটা ঘরও প্রায় জুটিয়ে দিয়েছিল গানের স্কুল খোলার জন্য। ঠিক তখনই আবার বাড়ি বদল। এবার হঠাৎ এত তাড়াহুড়ো করে মা কেন বাড়ি বদল করতে গেল ঋতু জানে না। সেরকম কোনও ঘটনাও তো ঘটেনি! তবে?

নন্দিতার উদ্বিগ্ন মুখখানা দেখতে দেখতে ফিক করে হেসে ফেলল ঋতু, শোনো, মা তুমি না দিনদিন ভীষণ অ্যাবনর্মাল হয়ে যাচ্ছো! নতুন পাড়া বলেই সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে? এত ভয়ের কী আছে?

একটা শ্বাস ফেলে নন্দিতা বলল, তুই বুঝবি না। আমার তো বাবা কথা বলে বউটাকে ভালই মনে হল, বেশ সরল সাদাসিধে। বাপের বাড়ি বলল জামশেদপুরে। প্রবাসী বাঙালিরা ভালই হয়।

বরটা কী করে?

বলল তো মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। মাসের মধ্যে আদ্দেক দিন ট্যুর-এ থাকেন ভদ্রলোক। বাচ্চা নিয়ে বউটাকে একাই থাকতে হয় তখন।

বাচ্চা বলছিস? ছেলে না মেয়ে? দেখেছিস?

মেয়ে। ক্লাস সিক্সে পড়ে।

নন্দিতার কৌতূহল নিঃশেষ হয়ে এসেছে। ভেতর বারান্দার দিকে যেতে যেতে বলল, গান শেখাটাকে সবাই যে কেন এত সহজ মনে করে কে জানে!

তারে ভিজে কাপড়টা মেলে দিতে দিতেই বাইরে গ্রিলের গেট খোলার শব্দটা পেল নন্দিতা। দু'একটা টুকরো কথাও শোনা যাচ্ছে। গলা নামিয়ে বলল, ঋতু, দেখ তো কে এল আবার!

ঋতু ঘর থেকে বেরোল না, জানালার পর্দা অল্প সরিয়ে দৃশ্যটা দেখল। ওরা তিনজন ঢুকছিল, একজন ঋতুর চেনা, রঞ্জন। বাকি দু'জন অচেনা। ভোরবেলা বাজবে এক্ষুণি, দ্রুতপায়ে ভেতর বারান্দায় এসে ঋতু বলল, রঞ্জনদা'রা আসছে।

অবাক হয়ে নন্দিতা বলল, সে আবার কে?

সেই যে টেলিফোনের জন্যে নির্মল মামা আমাকে যার কাছে পাঠিয়েছিল, ভুলে গেছ? কী স্বার্থপর বাবা! কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবার পর আর কাউকে তুমি চিনতেই পার না!

ভুরু কুঁচকে নন্দিতা বলল, রঞ্জন কী বললি?

রঞ্জন ভট্টাচার্য। উনিই তো ছোটাছুটি করে টেলিফোনটা ট্রান্সফার করিয়ে দিলেন।

মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, নামটা এখনও মনে পড়ছে না নন্দিতার। ভোরবেলা বাজল ডিং ডং। প্রণব দাদু এ সময় গভীর ঘুমে, ব্রেকফাস্টের পর বাজার সেরে এসে দ্বিতীয় কাপ চা এবং তারপর দ্বিতীয় প্রস্থ ঘুম। বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলে দিল ঋতু।

রঞ্জনই সামনে দাঁড়িয়ে, বুনো আর সুভাষ একটু পেছনে। সেই সেদিনের পর একমাস কেটে গেছে, আজ দ্বিতীয়বার দেখা। অল্প সংকোচের সঙ্গেই রঞ্জু বলল, টেলিফোন দিয়ে গেছে তো?

ঋতু হাসল– হ্যাঁ, তিন-চারদিন আগে দিয়ে গেছে। ভেতরে আসুন আপনারা।

রঞ্জু বলল, এরা আমার বন্ধু। বনমালী নস্কর আর সুভাষ ভৌমিক। আমরা কিন্তু তোমার মায়ের কাছে একটা কাজে এসেছি।

বুনো আর সুভাষ হাত তুলে নমস্কারের মতো একটা ভঙ্গি করল, ঋতু মনে হয় ব্যাপারটা লক্ষ্যই করল না। বলল, আপনারা ভেতরে এসে বসুন, আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি। বলে পর্দা সরিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকল ঋতু।

বাইরের ঘরখানা বেশ বড়ই, তবে এখনও ভাল বসবার ব্যবস্থা হয়নি। একধারে তক্তপোশে আদুলগায়ে শুয়ে আছে প্রণব, চোখ দু'টি বোজা। ঘুমিয়ে আছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে সস্তা কাঠের টেবিলে, স্তূপীকৃত বই রাখা আছে সেখানে। দেয়ালের দিকে দু'খানা পুরনো হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ার,

মোড়া। আর একদিকে একটা পুরনো কার্পেট বিছানো, তার ওপরে শোয়ানো তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা। ভদ্রমহিলা যে গান করেন সেটা নির্মলদার কাছে শুনেছিল রঞ্জু, এখন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তবে ঋতুকে দেখে প্রথম দিন যতোটা হাই-ফাই মনে হয়েছিল, ঘরের আসবাব দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। একটু স্বস্তিই বোধ করছিল রঞ্জু। বুনো আর সুভাষ কেমন সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে রঞ্জুর দিকে। ঋতু চলে যেতেই কাছে এসে ফিসফিস করে বুনো বলল, কী ব্যাপার গুরু? লাইন ফিট করলে কবে?

রঞ্জু কথাটার জবাব দিল না। দরজার বাইরে চটি খুলে রেখে ওরা ঘরে ঢুকছিল। তক্তপোশে শোওয়া মানুষটি একটু নড়েচড়ে উঠল বুঝি, চোখ অবশ্য এখনও বোজা। নিঃশব্দে চেয়ারে বসল রঞ্জু আর সুভাস, বুনো বসেছে মোড়ায়। অবাক হয়ে শায়িত মানুষটিকে দেখছিল রঞ্জু। বছর ষাটেক বয়স হবে। এরকম রোগা হাড় জিরজিরে চেহারা সচরাচর দেখা যায় না। বুকের হাড়গুলো দূর থেকেই গোনা যাচ্ছে। দুমড়ানো কৌটোর মতো মুখে ক'দিনের বাসি দাড়ি। একমাথা কাঁচাপাকা চুল। গায়ের রং কালোই বলতে হবে। নির্মলদা বলেছিল এই মানুষটিই নাকি এক সময় বিখ্যাত নকশাল নেতা ছিলেন। নকশাল আন্দোলনের যে গল্প রঞ্জু শুনেছে তার সঙ্গে এই মানুষটির চেহারা যেন ঠিক মেলে না।

ঘরে অন্য মানুষের অস্তিত্ব বোধহয় টের পেয়েছেন প্রণব। চোখ খুলে প্রথম ওপরে ঘুর্ণায়মান ফ্যানটিকে দেখেন, হাতড়ে শিয়রের কাছে রাখা চশ্‌মাটি নিয়ে চোখে পরেন, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসেন। দূরে বসা তিনজনকে এই প্রথম দেখছেন, তবু তার মুখে কোনও বিস্ময় ফুটল না। উদাস গলায় বললেন, কে তোমরা, ভাই?

দেখতে ওরকম হাড় জিরজিরে হলে কী হবে, মানুষটির প্রখর ব্যক্তিত্বের আভাস তার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পেল। সুভাষ আর বুনো রঞ্জুর দিকে তাকাল। তার মানে, এবার তুমি সামলাও, গুরু!

মুখে একটা বিনয়ের হাসি ফুটিয়ে তুলে রঞ্জু বলল, আমরা এ পাড়ারই ছেলে, এসেছি সবুজ সংঘ ক্লাব থেকে, মিসেস রায়ের সঙ্গে একটু দরকার ছিল...

ও।

বলে একটা হাই তুললেন প্রণব, উঠে দাঁড়িয়ে চটি পরলেন। ভিতরে যাবার সময় ওরা তিনজনেই লক্ষ্য করল ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। তিনজনের মধ্যে এ মুহূর্তে একমাত্র রঞ্জুই জানে ওটা পুলিশী নির্যাতনের স্বাক্ষর। কোনও কারণ নেই, তবু ভদ্রলোক সম্পর্কে অদ্ভুত একটা কৌতূহল অনুভব করছিল রঞ্জু। এরাই নাকি এক সময় সমাজ বদলের জন্যে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গ্রামে-গঞ্জে। সেই অসম যুদ্ধে শত শত ছাত্র-জনতা প্রাণ দিয়েছে পুলিশের হাতে।

বুনো অধৈর্য হয়ে উঠছিল, রঞ্জুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, কী মাইরি! বসিয়ে রেখে হাওয়া হয়ে গেল নাকি?

রঞ্জু বোধহয় মুখ করতেই যাচ্ছিল, ঠিক তক্ষুণি পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে নন্দিতা। ওরা তিনজনেই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় নন্দিতা ওদের বসতে বলল, নিজে বসল তক্তপোশে।

পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি বয়স হলে কী হবে, নন্দিতার চেহারায় এখনও যথেষ্ট চটক আছে। মেয়ের মতো লম্বা এবং ফর্সা নয় বটে, ছোটখাট চেহারা, একটু মোটার দিকেই বলতে হবে। এই মধ্য-চল্লিশেও গোল চাঁদের মুখে একটা স্নিগ্ধ লাবন্য রয়েছে। মাথায় বেশ বড় একটি খোঁপা। হাফস্লিভ ব্লাউজ আর জংলা ছাপের সিনথেটিক শাড়ির ম্যাচিং বেশ মানিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, কোথাও বেরোবে এক্ষুণি। হাতের বাহারি চামড়ার ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ছাতার বাট।

ছেলেগুলোকে দেখার পর যে নার্ভাস ভাবটা এসেছে সেটা কাটানোর জন্যে সহজ গলায় নন্দিতা বলল, তোমরা

এ পাড়ারই বুঝি?

বুনো বলল, হ্যাঁ।

রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে নন্দিতা বলল, বল ভাই, কী বলবে!

নন্দিতা যে রকম স্মার্ট ভঙ্গিতে কথাটা বলল সেটা সামাল দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল রঞ্জু। তারপর বিনীতভাবে বলল, আমরা এসেছি সবুজ সংঘ ক্লাব থেকে, পূজোর চাঁদার ব্যাপারে....

বুনো পকেট থেকে বিল বইটা বার করছিল, সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে কী একটা মনে করবার চেষ্টা করল নন্দিতা, বলল, দেখি, বিলটা দাও। এ পাড়ায় পূজো ক'টা হয়?

যন্ত্রচালিতের মতো বিল বইটা এগিয়ে দিতে দিতে বুনো বলল, পূজো বেশ ক'টাই হয়, তবে আপনাকে আর কোথাও চাঁদা দিতে হবে না। অন্য কোনও পার্টি এসে জবরদস্তি করলে আমাদের সবুজ সংঘে খবর দেবেন, আমরাই এসে ব্যবস্থা করে দেব।

ও বাবা, তোমরা আবার এসবও কর নাকি? বলে একটু হাসল নন্দিতা।

কথাটায় কী ছিল, অপমানে কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল রঞ্জুর। আপনিই চোখ চলে গেল ভেতরের দরজার দিকে, ঋতুও কথাটা শুনল কিনা কে জানে? সব রাগ গিয়ে পড়ছে এখন বুনোর ওপর। ওর পেছনে প্রবল একটা লাথি কষাতে পারলে বুঝি শান্তি হয়, কিন্তু তারও উপায় নেই।

নন্দিতা এক পলক বিলটা দেখলো, ভাবলেশহীন মুখে ব্যাগ থেকে কলম বের করে 'দুই শত এক টাকা' কেটে 'পঞ্চাশ টাকা' করল। তারপর একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আমার যা দেবার দিলাম। একদিন বিকেলের দিকে এসো, তোমাদের সঙ্গে গল্প করা যাবে!

গম্ভীর মুখে ওরা তিনজন উঠছিল। ওরা কিছু বলল না, বুনো শুধু হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

শরতের প্রখর রোদে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। এবারের বর্ষায় মোড়ের মাথায় কৃষ্ণচূড়া গাছটায় নতুন পাতা হয়েছে অনেক। সেই পাতার আড়াল থেকেই বোধহয় একটানা একটা ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছিল। কোনও কারণ নেই, তবু নিজেদের খুব তুচ্ছ আর অকিঞ্চিতকর মনে হচ্ছিল ওদের।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল সুভাষ, লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিক্ত গলায় বলল, মা আর মেয়ে দু'জনারই কেমন দেমাক, দেখলি!

কথাটা যে নিস্ফল আক্রোশের মতো শোনাল সেটা সুভাষ নিজেও অনুভব করছিল।

॥ তিন ॥

মহালয় এসে গেল প্রায়। আর মাত্র ক'টা দিন।

ক'দিন বৃষ্টি ছিল না, আকাশ ছিল মাজা বাসনের মতো ঝকঝকে, নীল। দু'এক খন্ড ভাসমান পরতের মেঘ ছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা থেকেই ছোট ছোট ধূসর মেঘের খণ্ডগুলো ঢুকতে শুরু করেছিল আকাশে। বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা কারও মনে হয়নি তবু। অনেক রাত পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়াটে চাঁদ খণ্ড মেঘের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ছেয়ে ছিল চরাচর। কখন যে সেই শীর্ণ একফালি চাঁদ মেঘের আড়ালে চাপা পড়ে গেল কেউ জানতেও পারেনি। ঘুমের ভেতরেই রঞ্জু টের পেয়েছিল বাইরে এলোমেলো হাওয়া বইছে শোঁ শোঁ, দূরে দূরে মেঘ ডাকছিল। বৃষ্টি এল ভোররাতে।

মেঘচাপা আলোয় আর ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভেতরেই একটা-দুটো করে বাস চলতে শুরু করল এক সময়, বড় রাস্তা থেকে সেই শব্দ মাঝে-মাঝে ভেসে আসছিল। গুটিসুটি হয়ে শুয়েছিল রঞ্জু। সুখি কখন এসে ফ্যান বন্ধ করে গেছে টের পায়নি। শীত করছিল অল্প। আধো ঘুমের ভেতরে যখন ভোরের ছোট ছোট স্বপ্নগুলো আসছিল একে একে, ঠিক তখনই কাজের মাসিটা এল। এ বাড়িতে ডোরবেল নেই, কড়ানাড়ার কর্কশ শব্দটা বোধহয় সুখি শুনতে পাচ্ছে না, উঠে গিয়ে রঞ্জুই সদর খুলে দিয়ে এল।

ক্যানিং না কারুইপুরের দিক থেকে আসে মাসিটা, এসেই বকবক শুরু করে দেয়। হাতের ভিজে ছাতা দরজার বাইরে গুটিয়ে রেখে এক গাল হেসে বলল, মুখখানা বেজার কেন ছোটবাবু? ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলুম বলে?

রঞ্জু কথাটার জবাব দিল না, মশারি তুলে বিছানায় ঢুকে গেল আবার। আপনমনেই মাসিটা বলে যায়, কী করব বল? পেটের জ্বালা বলে কথা! এ দুর্যোগে পশুপাখি পর্যন্ত ঘর থেকে বেরোয় না....

রঞ্জু ধমক দিয়ে বলে, মেলা বকবক না করে ভেতরে যাও তো!

যাই বাবা! যাই!

বেজার মুখে ও-ঘরে যাচ্ছিল মাসিটা। ভেতরের বারান্দা থেকে সুখি আর প্রতিভার টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছিল। সংসারেরই কথা সব। কী কী বাজার হবে, গ্যাস উনুনটা ভাল জ্বলছে না, মিস্ত্রিকে খবর দেওয়া দরকার– এসব। কাজের মাসির গলা পেয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল প্রতিভা– যাক, বাঁচালে বাবা! আমি আর সুখি এতক্ষণ তোমার কথাই বলছিলাম। মশলা বেটে দিয়ে যাওনি কাল, রান্নার কী হবে। বৃষ্টি দেখে সুখি খিচুড়ি করে ফেলবে বলছিল।

মাসি চোখ গোল গোল করে বলল, কোনও দিন এমনি এমনি কামাই করতে দেখেছ আমায়?

কোমল গলায় প্রতিভা বলল, তা দেখিনি, সে কথাইতো বলছিলাম। এসো চট্ করে বাসনগুলো মেজে মশলাটা করে ফেল।

সে আর তোমায় বলতে হবেনি কো! ভরসক্কালে আর খিচুড়ি খেতে হবে না তোমায়, ঝোলভাত খেয়েই অফিসে বেরোতে পারবে!

ফিরে যেতে গিয়ে হঠাৎ রঞ্জুর দিকে চোখ চলে গেল প্রতিভার আর অমনি মুখের কোমল ভাবটা সরে গিয়ে কেমন রুক্ষ কঠোর হয়ে উঠল। কর্কশ গলায় বলল, ঘরে বাজার নেই কিন্তু, রঞ্জু! বাজার করে দিয়ে ঘর থেকে বেরোবি। অন্ধ্রের কাটাপোনা খেতে খেতে মুখ পচে গেছে, আজকে ছোট মাছ নিয়ে আসবি।

শুনেই মেজাজটা বিগড়ে গেল রঞ্জুর, মশারির ভেতর থেকেই বলল, আজ পারব না, অনেক কাজ আছে। ছোড়দিকে ডিমের ঝোল করে ফেলতে বল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফোঁস করে উঠল প্রতিভা– কোন রাজ্য উদ্ধার করতে বেরোবি আজ শুনি? কোন কাজটা করিস সংসারের? কুটোটিওতো নেড়ে দেখিস না! একটা বাজার, তাও করতে পারবি না? যা-সব করে বেড়াচ্ছিস চারদিকে, তোর জন্যে পাড়ায় মুখ দেখানো যায় না!

গজর গজর করতে করতে ভেতরের বারান্দায় চলে যাচ্ছিল প্রতিভা। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ভেতরের ফুঁসে-ওঠা রাগটাকে সামাল দিচ্ছিল রঞ্জু। সুখি এখন রান্নাঘরে। মসলা বাটার একঘেয়ে শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। সেকেলে বাড়ি, রান্নাঘরে এগজস্ট ফ্যান লাগানো নেই। হাওয়ায় ফোঁড়নের গন্ধ ভেসে আসছিল ঘরের ভেতরে। রঞ্জু কাঠ হয়ে পড়ে আছে এখন। অপমানে ভেতরটা জ্বালাজ্বালা করছিল। এ বাড়ি ছেড়ে না গেলে রঞ্জু বাঁচবে না।

প্রতিভার রোজগারেই এ সংসার চলে। বড়দি নয়, রঞ্জুর সব রাগ গিয়ে পড়ছে এখন মৃত বাবার ওপর। মহা-অকর্মন্য ছিল লোকটা। রঞ্জুর দশ বছর বয়সে মা মারা গিয়েছিল পেটের ক্যান্সারে। বাপ লোকটা তারপরেও

অনেকদিন বেঁচে ছিল। তারাতলার দিকে কী একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করত। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর ক্লার্কশিপ পরীক্ষা দিয়ে প্রতিভা যে বছর ফুড ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেল ঠিক তার পরের বছর চাকরি ছেড়ে দিয়ে লোকটা ঘরে বসে গেল।

বাইরের গলি দিয়ে ছাতা মাথায় ছপছপ করে কে একজন যাচ্ছিল। রঞ্জু মশারির ভেতরে উঠে বসল। সুখি নিঃশব্দে ঘরে এসেছে। উনুনে ভাত চড়িয়ে এল বোধহয়। অভ্যস্ত হাতে মশারির কোণগুলো খুলছিল। প্রতিভা এখন স্নানে ঢুকেছে, সেই ফাঁকে একটা কিছু বলতে এসেছে সুখি। রঞ্জু জানে।

মশারি পাট করতে করতে নিচুগলায় সুখি বলল, ভাই, তুই আজ বাজারটা করে দিয়েই যাস। বড়দির মেজাজ ভাল নেই। অফিস থেকে ফিরে এসে বাজার হয়নি শুনলে আবার একপ্রস্থ চাঁচামেচি করবে। আমার আর সহ্য হয় না এসব!

কথাটা কেমন করে যেন বলল সুখি। বুকের ভেতরটা হঠাৎই টনটন করে উঠল রঞ্জুর। সুখির কপালে আর ঠোঁটের চারধারে শ্বেতিচিহ্ন, দু'হাতের আঙ্গুলের ডগায়ও রয়েছে। গায়ের রং চাপা হলেও ছোটবেলায় কী সুন্দর দেখতে ছিল ছোড়দিকে, রঞ্জুর স্পষ্ট মনে আছে। দু-ক্লাস ওপরে পড়ত সুখি, ক্লাস সেভেনে পড়বার সময়ই বোধহয় প্রথম রোগটা দেখা দেয়। স্কুলে খেলতে গিয়ে একদিন পড়ে গিয়েছিল, ঠোঁটের ওপরে ডান দিকটায় ছড়ে যায়। সেখানেই গোলাপি একটা বিন্দু প্রথম দেখা দেয়। তারপর সেটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায় চারদিকে।

বাথরুমের দিকে কান খাড়া করে আছে সুখি, প্রতিভার এখনও মিনিট দশেক লাগবে। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ভাইয়ের মাথায় হাত রাখল, ফিসফিস করে বলল, আজ সকাল বেলাতেই দেখছি মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেছে!

অপমানের জ্বালাটা মিইয়ে যেতে সময় নিচ্ছিল, রঞ্জু মুখ ভার করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। বড়দিকে অবশ্য খুব একটা দোষ দেয়া যায় না, রঞ্জু বোঝে ব্যাপারটা। বাবা বড় মেয়ের বিয়ের কোন উদ্যোগই নেননি কোনওদিন। ছোট মেয়ের তো সে প্রশ্নই ছিল না। মুখ ভরা শ্বেতির দাগ, কে-ই বা রাজি হবে বিয়েতে? কিন্তু প্রতিভার চেহারা খারাপ ছিল না। গায়ের রং ফর্সা, বেশ মিষ্টিই ছিল তাকে দেখতে। চাকরিতে জয়েন করার পর ভাল ভাল বিয়ের প্রস্তাব আসত কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাবা কানেই তুলত না ওসব। আসলে লোকটা ছিল স্বার্থপর। মা মাঝে মাঝে ঘ্যান-ঘ্যান করত, ও কি তোমার সংসারের জন্যে সারাজীবন বেগার খেটে যবে? ওর নিজের জীবন নেই। বাবা ছেলেমেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, রঞ্জুর পড়াশুনাটা শেষ হোক, বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! প্রতিভারও বোধহয় তখন বিয়ের ব্যাপারে তেমন গা ছিল না। কানুনগোপাড়ার তন্ময় মজুমদারের সঙ্গে তখন তাকে দেখা যেত অফিস ছুটির পরে গঙ্গার ধারে কিংবা ভিক্টোরিয়ায়। তন্ময় যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে জোকায় মেনেজমেন্ট করেছে। কত সম্ভাবনা সামনে।

ও মাসি! মাসি!

বাথরুম থেকে বারান্দায় বেরিয়েছে প্রতিভা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুটিয়ে গোল হয়ে চেহারাটাই শুধু নষ্ট হয়নি, গলার স্বরটাও কর্কশ হয়ে গেছে। প্রতিভার গলা পেয়ে ত্রস্তপায়ে রান্নাঘরের দিকে সরে গেল সুখি। কলঘর থেকে মাসি গলা তুলেছে– হ্যাঁ গো, ডাকছ কেন? আমি প্রেসার কুকারটা মেজে আসছি, দাঁড়াও!

গামছায় জড়ানো ভেজা চুল নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকছিল প্রতিভা, চেঁচিয়ে বলল, বাথরুমের কাপড়গুলো সার্ফে ভেজানো আছে, একটু পরিষ্কার করে কেচো।

পরিষ্কার করেই তো কাচি! কিন্তু এই বৃষ্টি-বাদলায় ভেজা কাপড় শুকোবে?

এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না, মেঘ পাতলা হয়ে আসছে দেখছ না?

সে তুমি যেমন বলবে! পয়সা দিয়ে রেখেছ যখন কাজ করতে বললে না তো আর বলতে পারব না। রোদ না উঠলে কিন্তু...

শোবার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল প্রতিভা। অফিসে পরে যাবার শাড়ি বের করে রেখেই চানে ঢুকে সে।

গায়ে জড়ানো আটপৌরে কাপড়খানা খুলে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়ায়। রোজ ঠিক এ সময়টাতেই নিজেকে কয়েক মুহূর্ত দেখবার সময় পায় সে। আজও দেখল। তারপর বড় কৌটো থেকে পাউডার ঢালে ঘারে, গলায়, বুকে। মাথার চুল পাট করে শাড়ি-ব্লাউজ পরে নিতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগে না প্রতিভার। এর পরের কাজটা হল ঘরের কোণে কাঠের ছোট্ট ঠাকুরের আসনের সামনে এসে দাঁড়ানো। সেখানে লক্ষ্মী, কালী, ঠাকুর, শ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং বিবেকানন্দর ছবি পাশাপাশি রয়েছে। দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ধূপদানিতে গুঁজে দেয় এবং তারপর ঠিক এক মিনিট চোখ বুজে জোরহাত করে ঠাকুরের সামনে দাঁড়ায়।

আজও ঠাকুর প্রণাম সেরে অন্যদিনের মতোই হাঁক দিল প্রতিভা, সুখি, টেবিলে খাবার দিয়েছিস? ন'টা বেজে পাঁচ হয়ে গেছে, আজ মনে হয় লেটমার্ক পড়ে যাবে! বাঁশদ্রোনীর কাছে রাস্তাটা বর্ষায় যা হয়ে আছে, পূজো এসে গেল এখনও সারানোর নাম নেই, কোনদিন ছিটকে পড়ে মরব! আজ আবার মেট্রোর মান্থলি কাটতে হবে....

বারান্দায় গরম ভাতের থালাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে অসম্পূর্ণ বাক্যটা শুনল সুখি। চল্লিশ পেরোনোর আগেই প্রতিভার মাথার চুল কমে গেছে অনেক। এখন কেমন ঠাকুমা ঠাকুমা দেখতে হয়েছে। চোখে চশমা। আগে কী সুন্দর বেণী হত, কোমর ছাপিয়ে নামত চুল। পুরনো অ্যালবামে দু-বোনের একটা জোড়া ছবি আছে। ফ্রকপরা সুখি আর সদ্য শাড়িপরা প্রতিভা,, লম্বা বেণীটা বুকের সমনে এনে ডান হাতে ধরে আছে। তন্ময়দা গোলপার্কের একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে তুলিয়ে দিয়েছিল, এক সরস্বতী পূজোর দিনে। কী নিষ্ঠুর তন্ময়দাটা! বড় চাকরি পেয়ে বড় ঘরে বিয়ে করে হঠাৎ নিপাত্তা হয়ে গেল। লুকিয়ে কতদিন কেঁদেছে প্রতিভা, সুখিই সেই গোপন কান্নার একমাত্র সাক্ষি।

ডাল, ভাজা আর হালকা একটা পোনামাছের ঝোল দিয়েছে, অফিসে বোরোবার আগে এর থেকে বেশি কিছু খায় না প্রতিভা। তবু সুখি বলল, কালকের নিরামিষ তরকারিটা আছে, দেব?

খেতে খেতেই মাথা নেড়ে প্রতিভা বলল, না।

কবজি উল্টে ঘড়ি দেখছিল প্রতিভা। বাসস্টপ থেকে অটো ধরে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে যেতে হবে, সেখান থকে মেট্রোয় এসপ্ল্যানেড, তারপর পায়ে হাঁটা।

গোগ্রাসে খাচ্ছে এখন প্রতিভা। বারান্দাটায় পাখা নেই। একটু গরম হচ্ছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অকারণেই। বড়দির জন্যে কেমন মায়া অনুভব করছিল সুখি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়দির মেজাজটা খিটমিটে হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, তবে তার জন্যে আমরাই তো দায়ী! সুখি ভাবছিল।

বাথরুম থেকে দাঁত ব্রাশ করে বেরোচ্ছিল রঞ্জু। মুখখানা গম্ভীর, একবার আড়চোখে তার দিকে তাকাল প্রতিভা। কি রকম উদভ্রান্তের মতো চেহারা হয়েছে। চৌপর দিন ক্লাবের বখাটে ছেলেগুলোর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছাইপাশ কী সব গিলে অনেক রাতে বাড়ি ঢোকে, কোন দিন কোন অ্যান্টি-সোশ্যাল এ্যাক্টিভিটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে কে জানে!

বড়দির সামনে থেকে দ্রুত সরে যেতে চাইছিল রঞ্জু। সামনে থাকলেই উপদেশের সুরে দু-চারটে কথা বলবে প্রতিভা, তাতে মেজাজটা আরও বিগড়ে যাবে। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কী মনে পড়তে প্রতিভা ডাকল, রঞ্জু, শোন!

ফিরে তাকিয়ে রঞ্জু বলল, কি?

ঘাড় না তুলেই প্রতিভা বলল, সামনে আয়, কথা আছে।

কী বলবি বল, এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি।

প্রতিভার খাওয়া হয়ে গেছে, কাচের গ্লাস থেকে জল খেল ঢক ঢক, এঁটো হাতেই চেয়ারে ঘুরে বসে বলল, দেবু মল্লিকের বাড়িতে নাকি শুনলাম নতুন কোন ভাড়াটে এসেছে?

প্রশ্নটা শুনে খুবই অবাক হয়েছে রঞ্জু, তবে সেটা বুঝতে না দিয়ে শুধু বলল, হুম!

ও বাড়িতে ইদানী খুব যাতায়াত করছিস তুই?

রঞ্জু আকাশ থেকে পড়ল। এ পর্যন্ত মাত্র দু-বার গিয়েছে সে ও-বাড়িতে। প্রথমবার পূজোর চাঁদা তুলতে, ক'দিন আগে দ্বিতীয়বার গিয়েছিল ঋতুর অনুরোধে। ব্যাপারটা খুবই সামান্য।

সন্ধ্যেবেলায় গোলপার্ক থেকে ফিরছিল, বাস স্টপে নেমেই ঋতুর সঙ্গে দেখা। রঞ্জু নয়, পেছন থেকে ঋতুই প্রথম ডেকেছিল, রঞ্জন দা!

রঞ্জু অবাক হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল ঋতু। পরনে সালোয়ার-কামিজ, হাতে একটা বইয়ের ব্যাগ, কোথাও বোধহয় কোচিং-এ গিয়েছিল। অনুযোগের সুরে বলল, বাসে কতবার ইশারা করে ডাকলাম, আপনি দেখতেই পেলেন না। খুব রাগ হচ্ছিল!

রঞ্জু সত্যি লজ্জা পেয়েছিল। বলল, সত্যি শুনতে পাইনি!

এত অন্যমনস্ক থাকেন কেন সব সময়?

বাসস্টপ থেকে বেরিয়ে ওরা পাড়ার রাস্তা ধরে হাঁটছিল। কোনও সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি এরকমভাবে কোনওদিন হেঁটেছে বলে রঞ্জুর মনে পড়ল না। বুকের ভেতরটা হঠাৎই কেমন দুপদাপ করে উঠল। ঋতুর প্রশ্নের জবাবে কী বলবে তা-ও ঠিক ভেবে উঠতে পারল না। একটু ইতঃস্তত করে শুধু বলল, না, মানে, ঠিন তা নয়....

ঋতু শব্দ করে হেসে উঠল, কার কথা এত ভাবেন?

ঋতুর গলায় কোনও সংকোচ নেই, যেন সে রঞ্জুর কতদিনের চেনা। এ প্রশ্নের উত্তর কী করে দিতে হয় রঞ্জু জানে না। কান মাথা গরম হয়ে উঠছিল। ঋতুই আবার বলল, আপনার জন্যেই টেলিফোনটা এত তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল, অথচ আপনাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত জানানো হয়নি।

রঞ্জু মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, না, না, তাতে কী....

কথাটা যে মিথ্যে সেটা রঞ্জু ছাড়া কেউ কি জানতে পারবে কোনওদিন? টেলিফোন অফিসে সে মোটেও যায়নি, আসলে, যাওয়ার কথা তার মনেই ছিল না। হয়তো নিয়ম মাফিকই কাজটা হয়েছে, রঞ্জুর সেখানে কোন ভূমিকাই নেই। এসব সামান্য কারণে আগে কখনও তার অপরাধবোধ হয়নি, এখন হচ্ছে।

ঋতু বলল, সেদিন আপনারা ওরকম করে চলে এলেন, আমার খুব খারাপ লাগছিল। একদিন ভেবেছিলাম আপনাদের বাড়ি যাব, যাওয়া হয়নি। নতুন পাড়া, কারও সঙ্গে এখনও চেনাজানা হয়নি, তাছাড়া আপনার বাবা-মা'ই বা কী ভাববেন!

রঞ্জু গম্ভীর গলায় বলল, আমার বাবা-মা নেই।

এরপর নিশ্চয়ই বাড়িতে কে কে আছে সে প্রশ্নটা উঠবে এবং তারপর আপনি কী করেন– সেই ভয়ংকর প্রশ্নটাও অবধারিতভাবে উঠে পড়বে। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তৃতীয় দিনের আলাপে রঞ্জু এসব বিষয়ে যেতে চায় না। মোড়ের ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছিল রঞ্জু, গন্ধটা ঋতুর শরীরের ভেতর থেকে আসছে নাকি কোথাও কোনও অচেনা ফুল ফুটেছে ঠিক বুঝতে পারছিল না।

অফিস ফেরত লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে রঞ্জুকে দেখছিল অবাক দৃষ্টিতে, যেন কোনও সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ থাকতে পারে না। ঋতুর ভ্রুক্ষেপ নেই। রঞ্জুর কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্তে চুপ করে রইল সে। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে আবদারের সুরে বলল, আজ চলুন না আমাদের বাড়িতে। আপনার কোনও কাজ নেই

তো?

আপত্তি করতে পারেনি রঞ্জু, গিয়েছিল। ভাগ্যিস তখন ঋতুর মা ছিল না ঘরে, থাকলে নিশ্চয় চাকরি-বাকরির কথা জিজ্ঞেস করত। রঞ্জুকেও বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলতে হত। বাইরের ঘরে নয়, একেবারে ভেতরের ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল ঋতু। নিজেই চা করেছে। বিস্কুট। অবিশ্রাম বকবক করছিল ঋতু। আগে কোনাপাড়ায় ছিল সেখানকার গল্প, কলেজের বন্ধুদের গল্প। রঞ্জু মন দিয়ে শুনছিল না, তবু ভাল লাগছিল। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে একা ঘরে বসে গল্প করার মতো আশ্চর্য ঘটনা– এ-ই প্রথম। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল তার শরীর, মন।

কিন্তু বড়দি জানল কী করে সে ঘটনা? নিশ্চিত কেউ এসে বড়দির কানে তুলে দিয়ে গেছে কথাটা। ভাবতে গিয়ে মাথার ভেতরে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল রঞ্জুর। বড়দির ওপর নয়, রাগটা গিয়ে পড়ছে পাড়ার লোকগুলোর ওপর। ইচ্ছে করছে পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে, আমার যা খুশি করব, যেখানে খুশি যাব তাতে কার বাপের কী? সে জানে প্রতিভা কারও নাম বলবে না, তবু চাপা হিংস্র গলায় রঞ্জু বলল, তোকে এ খবর কে দিয়েছে?

সেটা জেনে তোর কী হবে? কথাটা সত্যি কিনা বল?

রঞ্জুর চোখমুখ রক্তবর্ণ হয়ে এসেছে। শরীরের পেশীগুলো টানটান, যেন এক্ষুণি সে একটা খুন করে ফেলতে পারে। মুহূর্তের জন্যে মনে হল সে একটা যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে এখন। একপক্ষে ওরা তিন-চারজন আর অপর পক্ষে পাড়ার সব ভদ্রসভ্য মানুষগুলো, যাদের চাকরি-বাকরি, সংসার, ফ্ল্যাট, উপরি, পূজোর শপিং, বছরে একবার বেড়াতে যাওয়া– সব আছে।

কে তোর কাছে চুকলি কেটে গেছে সেটা তোকে বলতেই হবে। রঞ্জু বলল।

ভাইয়ের মুখ দেখে প্রতিভা কী বুঝল কে জানে, গলা নরম করে বলল, ভাই, শোন, মাথা গরম করিস না। ফ্যামিলিটা শুনলাম সুবিধের নয়, ভদ্রমহিলার চলাফেরা নাকি সন্দেহজনক। ওসব ফ্যামিলির সঙ্গে মেলামেশা করে তুই আবার কোন্ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বি, তাই বলেছিলাম....

রঞ্জু ঠিক করেছিল বড়দির সঙ্গে কোনও কথা কাটাকাটিতে যাবে না, কিন্তু হঠাৎই বুঝি মাথার ভিতরে একটা ফিউজ উড়ে গেল, গলা বিকৃত করে সে চেঁচিয়ে উঠল, ও, এরই মধ্যে সবার জানা হয়ে গেছে ফ্যামিলিটা খারাপ! আর যারা বলছে তারা সবাই সাধু! আমার যখন খুশি, যতবার খুশি ও-বাড়িতে যাব! কেউ যদি ওদের সম্পর্কে কোনও বাজে কথা বলে জিব টেনে ছিঁড়ে নেব!

ঘরে এসে পাজামার ওপর একটা জামা চাপিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিল রঞ্জু। ছুটে এসে শুকনো মুখে সুখি শুধু বলল, ভাই, একটা কিছু খেয়ে বেরো! রঞ্জু শুনেও শুনল না।

॥ চার ॥

এবার কালীপূজোর পরই ঝপ করে শীত পড়ে গেল।

এখন, এই সন্ধ্যেরাতেই, হালকা কুয়াশা নামছে মাঠে। দূরের ফ্ল্যাট-বাড়ি আর ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো মলিন, ঝাপসা। রঞ্জু শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিল। আকাশে চাঁদ নেই, অজস্র তারা ফুটে আছে। চারদিক থেকে মেঘের দল উধাও হয়ে গেছে কবে। আর বৃষ্টি হবে না এ বছর। মাথার ভেতরটা হালকা হয়ে আসছিল ধীরে, অল্প নেশা হয়েছে। ঘাসের শিশিরে শার্টের পিঠের দিকটা একটু ভেজা ভেজা লাগছে, রঞ্জু তবু শুয়েই রইল। ও মুহূর্তে তার বুকের ভেতরকার সব গ্লানি, হতাশা আর রাগ যেন বেরিয়ে এসে বাইরের কুয়াশায় মিশে যাচ্ছে ধীরে। ভাল লাগছিল।

বুনো আর সুভাষ বসে আছে মুখোমুখি। প্লাস্টিকের গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে মুখ বিকৃত করল বুনো। তরল আগুন পুড়িয়ে দিচ্ছে ভেতরটা, যেন আগুনের এক সরীসৃপ ওপর থেকে গড়িয়ে নামছে নীচে। যন্ত্রণাটা সইয়ে

নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল বুনো, তারপর প্লাস্টিকের গ্লাসটা ছুঁড়ে দিল মাঠের কোণে আগাছার ঝোপে কার উদ্দেশে কে জানে, অশ্লীল একটা গালাগাল দিয়ে বলল, জালি! সব শালা জালি!

বুকপকেট থেকে বিড়ির বান্ডিল বের করে একটা বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছিল সুভাষ। মাঠে এখন তেমন হাওয়া নেই, তবু দেশলাইয়ের কাঠিগুলো বারবার নিভে যাচ্ছিল। কাত হয়ে শুয়ে প্যান্টের পকেট থেকে লাইটার বের করে বুনো বলল, এদিকে একটা ছাড় দেখি!

তিনজনের মধ্যে বুনোই আজ একটু বেশি খেয়েছে। কী হয়েছে আজ ওর কে জানে, মাঝে-মাঝেই খিস্তি ঝাড়ছিল।

বিড়িতে লম্বা একটা টান দিয়ে বুনো বলল, মদনা শালা আজও জালি মাল দিয়েছে! কাল গিয়ে কেলাব শালাকে!

কেউ কথাটার ওপর কোনও মন্তব্য করল না।

ওরা বসে আছে ছোট্ট মাঠটার এক কোণে, মাঝারি সাইজের একটা নিমগাছের নীচে। পাড়ায় এই একটাই মাঠ এখন, যদিও ঢোকার মুখে দক্ষিণের গেটে সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'সবুজ সংঘের খেলার মাঠ', খেলাধুলো এখানে বিশেষ হয় না। ক'বছর আগেও এসব অঞ্চল করপোরেশনের বাইরে ছিল, করপোরেশনে ঢোকার পরই চারদিকের সব ফাঁকা জমিগুলো প্লটে প্লটে ভাগ হয়ে গেছে, দুদ্দাড় করে উঠে গেছে সব চারতলা-পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ি।

মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে সবুজ সংঘের ক্লাবঘরটা আজ খোলা হয়নি। রোজ সন্ধ্যেবেলায় ওটা খোলার দায়িত্ব বুনোর, আজ সে চলে গিয়েছিল গড়িয়ার খালপাড়ে, মদনের দিশি মালের দোকানে। বুনোর আজ মাইনে হবার কথা ছিল, হয়নি। দুপুরে নির্মল যখন টিফিন করতে বেরিয়েছিল তখন তার ব্যাগ থেকে দুটো পাত্তি ঝেড়েছিল সে। বন্ধুদের অবশ্য সেকথা বলেনি। হঠাৎ কী মনে পড়তে সুভাষ টেনে টেনে বলল, অ্যাই শালা, বুনো, তোর বসকে বল না আমাকে একটা কোথাও ঢুকিয়ে দিতে!

অন্ধকার মাঠের কুয়াশায় সুভাষের কথাটা কেমন অবাস্তব আর হাস্যকর শোনাল। বুনোর মাথা ঝুঁকে আছে বুকের ওপর, হাতের বিড়ি নিভে গেছে কখন খেয়াল নেই, সুভাষের কথাটা শুনতে পেল কি-না বোঝা গেল না। সামনে ছড়ানো পায়ে লাথি মেরে সুভাষ বলল, অ্যাই, কেলানে! শালা ধুনকি এল নাকি তোর? এইমাত্র যে বললি জালি মাল দিয়েছে মদনা!

বুনো মাথা তুলল, চোখ দুটি বোজা, হাতের নিভে যাওয়া বিড়িতে একটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলল, আমার নেশা হয়নি, বললাম তো!

ঝোলা ব্যাগের ভেতরে মালের বোতলটা রয়েছে। ফাঁকা বোতলটা বের করে অন্ধকারেই ঘুরিয় ফিরিয়ে দেখল বুনো, ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও কী ভেবে আবার ঝোলায় ঢুকিয়ে রাখল। মিনারেল ওয়াটারের বোতলটাও শেষ হয়ে এসেছে, দু-ঢোক জল খেয়ে হাঁ করে বড় বড় শ্বাস ফেলছিল বুনো, সুভাষ বলল, নেশা হয়নি বলছিস?

বোকা–! যা বললাম সেটা একটু কর আমার জন্যে! নির্মল শালার কত জানাশুনো, মন্ত্রীফন্ত্রী কত লোককে চেনে, ও শালা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে। তুই শালা আমার ন্যাংটোপোদের বন্ধু, আমার জন্যে একটা ক্যাচ মার না, গুরু!

সুভাষের গলায় কী ছিল, চোখ মেলে বুনো বলল, কী করতে হবে বলবি তো?

আপনমনেই সুভাষ বলল, বিএ পাস করেছি সেই কবে, ভুলেই গেছি, মাইরি! তারপর গুচ্ছের টাকা খরচ করে কম্পিউটার কোর্স করলাম, বাড়িতে আর প্রেস্টিজ থাকছে না....

হা হা করে হেসে উঠে বুনো বলল, নির্মল দেবে তোকে চাকরি ? শালা আর লোক পেলি না? পার্টির ছেলেগুলোই ওর পেছনে ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়ে যাচ্ছে....

আমাকেই কোনদিন পোদে লাথি মারবে দেখিস!

সাড়ে ন'টা বাজে প্রায়। দক্ষিণ শহরতলির এসব জায়গা সন্ধ্যেরাতেই ঝিমিয়ে পড়ে। বাস-ট্রাম ঠেঙিয়ে লোকজন ঘরে ঢুকে যায় আটটার মধ্যে, দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। বুনোর হাসির শব্দটা নিঝুম ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে মাঠের অন্ধকারেই ফিরে আসছিল। রঞ্জু আর সহ্য করতে পারছিল না, উঠে বসে বুনোর পেছনে পা দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় বলল, অ্যাই হারামি, মাতলামি হচ্ছে!

উল্টে পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল বুনো। তিনজনের মধ্যে, রঞ্জুই সবার থেকে বড়সড় এবং শক্তিশালী। তুলনায় বুনোর চেহারা একেবারেই ছোটখাট। কালো, রোগা, লম্বায় পাঁচফুটের বেশি হবে না। কপাল ঢাকা চুল থাকায় ওকে খুব অল্প বয়স্ক দেখায়। সুভাষের চেহারা বরং অনেকটাই আটপৌরে। লম্বাও নয়, আবার ঠিক বেটেও নয়, শ্যামবর্ণ, মাঝারি স্বাস্থ্য, তবে মাথায় চুল কম থাকায় একটু টেকো-টেকো দেখতে লাগে।

হাত জোড় করে বুনো বলল, মাফ করে দাও, গুরু! মুখ্যসুখ্য লোক, অনেক কষ্টে মাধ্যমিকটা পাস করেছিলাম... তোমরা কত লেখাপড়া করেছ... বিএ... এমএ...

পাশ থেকে সুভাষ বলে উঠল, অ্যাই, বোকা–, আওয়াজ দিচ্ছিস? মারব এক থাবড়া তখন বুঝতে পারবি! বললাম, ন্যাংটো পোদের বন্ধু, আমার জন্য নির্মল সেনগুপ্তকে একটা ক্যাচ মার, তা নয়, তখন থেকে শালা ভার্টিং করে যাচ্ছে !

বুনো জিব কেটে বলল, ভার্টিং নয়, গুরু! সত্যি বলছি। মাধ্যমিকে এ বাজারে কোনও চাকরি হয় না।

টেনে টেনে সুভাষ বলল, বিএ পাস দিয়ে আমার ইয়ে হয়! আমাকে আর রঞ্জুকে দেখছিস না, বোকা–!

উদাস গলায় বুনো বলল, নির্মল দা মনে হয় খুব শিগগির জেরক্সের পাট তুলেই দেবে। আজ সকালে ঝাঁপ খুলেই কাঁদুনি গাইছিল, পোষাচ্ছে না নাকি। তাছাড়া মেশিন দুটোই পুরনো হয়ে গেছে, প্রবলেম দিচ্ছে রোজ, কাস্টোমারও কমপ্লেন করছে।

সুভাষ আর একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল, বলল, ওই জায়গাটায় নতুন কিছু করবে নাকি, নির্মল দা? কিছু বলল? হেভি পজিশন দোকানটার, যা করবে তাই চলবে।

হঠাৎ কী মনে পড়তে বুনো বলল, রঞ্জু, তোকে বলতে ভুলেই গেছি, সেই যে সেই ভদ্রমহিলা, দেবু মল্লিকের ভাড়াটে, ইদানীং দেখছি খুব যাতায়াত করছে নির্মলের কাছে, কী ধান্ধা বল তো গুরু?

মাঠটার চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, পুবদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা আটফুট চওড়া পিচ রাস্তা আছে, ঝড়ের বেগে একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে যাচ্ছিল সেখান দিয়ে, রঞ্জু সেদিকেই তাকিয়ে আছে, বলল, কী ধান্ধা আমি কী করে জানব?

হি হি করে হেসে উঠল বুনো– আমাদের কাছে লুকোস না, বস!

রাগতস্বরে রঞ্জু বলল, মানে?

দুঃখিত গলায় সুভাষ বলল, তুই আজকাল আর আমাদের পাত্তা দিচ্ছিস না, বস! অপর লোকের মুখ থেকে তোর কথা শুনতে হয়...

বুনো বলল, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ, গুরু, আর আমরা জানব না! ওই চুমকি মেয়েটার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলে সেদিন?

রঞ্জু একটু সতর্ক হয়ে গেল, বলল সেদিন কোথায়? সে তো পূজোর আগের ঘটনা, বাসস্টপে দেখা হয়েছিল, বলল একটু এগিয়ে দিতে, দিলাম। তো কী হয়েছে তাতে? পাড়ার মেয়ে, একটু এগিয়ে দিয়েছি তাতে দোষ

হয়ে গেল?

অন্ধকারে বুনো এবং সুভাষের মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না, রঞ্জু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবছা দুটি মুখের দিকে তাকিয়ে আছে এখন। গত অষ্টমী পূজোর দিনে যা ঘটেছিলো সে সম্পর্কে ওরা কিছু জানে কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অষ্টমী পূজোর রাতে ওদের মাল খাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল নরেন্দ্রপুরে, বুনোর এক বন্ধুর টেকে। সন্ধ্যে বেলায় সবুজ সংঘের পূজোয় ধূপদানে নিয়ে আরতি করতে নেমেছিল বুনো আর সুভাষ, সঙ্গে জুনিয়র ব্যাচের আরও কয়েকটি ছেলে।

রঞ্জু দাঁড়িয়ে ছিল একধারে, হঠাৎ পেছন থেকে এসে ঋতু ডেকেছিল, রঞ্জন দা! শোনো!

ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল রঞ্জু। ভারি সুন্দর ছাপা সিল্কের একটা শাড়ি পরেছে ঋতু, খুবই সামান্য প্রসাধন, কপালে টিপ– শাড়ি পরা ঋতুকে দেখা সেই প্রথম। পূজো প্যান্ডেলের ঝলমলে আলোয় ঋতুকে দেখাচ্ছিল দেবী প্রতিমার মতো। হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল রঞ্জু। এত লোকের মধ্যে ঋতু এসে তাকেই ডেকেছে, কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল সে।

হাতের ইশারায় এক পাশে ডেকে নিয়ে ঋতু বলেছিল, আজ তো সারারাত মেট্রো চলবে, আমাকে একবার উত্তর কলকাতায় নিয়ে যাবে? কতকাল উত্তর কলকাতার ঠাকুর দেখা হয়নি, সাউথে আসার পর আর কোনওদিন যাওয়াই হয়নি ওদিকে। মাকে আজ কত সাধাসাধি করলাম, কিছুতেই রাজি হল না, তুমি যাবে?

এর আগে মাত্র তিনদিন দেখা হয়েছে। মেয়েটা যে ঠিক কখন থেকে তাকে তুমি বলতে শুরু করেছে রঞ্জুর মনে পড়ল না। ঋতু মুখে কী মেখেছে, রঞ্জুর মনে হচ্ছিল গর্জন তেলমাখা প্রতিমার মুখের মতোই সে মুখ চকমক করছে। প্রায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো রঞ্জু গিয়েছিল উত্তর কলকাতায়। কত জায়গায় ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখেছে– বাগবাজার, দেশবন্ধু পার্ক, আহিরি ঠোলা , সিমলা ব্যায়াম সমিতি। অবিশ্রাম বকবক করেছে ঋতু। যেন একটি বালিকাকে নিয়ে বেরিয়েছে প্রৌঢ় কোনো গার্জিয়ান– রঞ্জুর এরকমই মনে হচ্ছিল। আশ্চর্য, বন্ধুদের কথা মনে পড়েনি একবারও, মনে পড়েনি নরেন্দ্রপুরে মাল খাওয়ার প্রোগ্রামের কথা। ব্যাপারটা নিয়ে বুনো আর সুভাষের সঙ্গে মন কষকষিও হয়েছে ক'দিন, সেদিন রঞ্জু না থাকায় মাল খাওয়ার প্রোগ্রামটাই নাকি ক্যানসেলড হয়ে গিয়েছিল।

সুভাষ বলল, আমাদের তো শালা কিছু হবে না লাইফে, তোর যদি কিছু হয় তাতে আমরা খুশি! মাইরি বলছি, রঞ্জু, সেদিন হঠাৎ বাসে দেখেছি মেয়েটাকে হেভি টল, চোখের কটা রং দেখেই চিনলম– তোর শালা থোবড়া ভাল, তোর সঙ্গে মানাবে!

ওরা উঠছিল। তিনজনেই পা টলছে, টলতে টলতেই বুনো বলল, অ্যাই শালা, সুভাষ, বন্ধুর লাভারকে নিয়ে খারাপ কথা বলবি তো থোবড়া পালিশ করে দেব।

একটা হেঁচকি তুলে সুভাষ বলল, অ্যাই, বোকা–! আমি গুরুর লাভারকে নিয়ে খারাপ কথা বললাম কখন? রঞ্জু, বল মাইরি! ও শালার নেশা হয়ে গেছে, ফালতু ফালতু মদনাকে খিস্তি করছিল। রঞ্জুর লাভার মানে আমাদের কে হয় জানিস? বল, শালা জানিস? হেভি চুমকি দেখতে...

বউদি!

বলে খিক খিক করে হাসতে শুরু করল বুনো। রঞ্জুর আর সহ্য হচ্ছিল না, মাথার ভেতরে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, বাঘের মতো গর্জন করে উঠল সে, ঋতুকে নিয়ে আর একটা কথা বলবি তো এই মাঠের মধ্যে তোদের পুঁতে ফেলব!

অন্ধকার মাঠের ভেতরে রঞ্জুকে এখন দেখাচ্ছে একটা দানবের মতো, বুনো আর সুভাষ নেশার মধ্যেও একটু গুঁটিয়ে গেল, মিন মিন করে সুভাষ বলল, তুই মিছিমিছি রাগ করছিস, রঞ্জু! ওই মেয়েটার সম্পর্কে কোনও খারাপ কথা কিন্তু বলা হয়নি।

দক্ষিণের লোহার গেটটা খোলাই থাকে, গেট পেরিয়ে ওরা পিচ রাস্তায় উঠে এল। মাথার ওপরে তারাভরা আকাশ। ওরা হাঁটছিল ধীরপায়ে। দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলো ঘিরে ঘন হয়ে আছে কুয়াশা, পোকা উড়ছে। এরই মধ্যে নিঝুম হয়ে গেছে পাড়া । দু'ধারে উঁচু উঁচু সব ফ্ল্যাট বাড়ি, অধিকাংশ ফ্ল্যাটেরই আলো নেভানো। কাছেই কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল, তার জবাব এল অনেক দূর থেকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বুনো চেঁচিয়ে উঠল, কুকুররাই শালা হেভি র‍্যালায় আছে! শালাদের কাজও নেই, বিশ্রামও নেই! দেখলে মনে হবে লেজ নেড়ে ডিউটি করে বেড়াচ্ছে সারাদিন!

যেন খুব গভীর একটা দর্শনের কথা বলে ফেলেছে বুনো, সুভাষ এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, যা বলেছিল, গুরু! মাধ্যমিকেই যা দিলি মাইরি, খাটে ওঠা পর্যন্ত মনে থাকব! কুকুররাও শালা আমাদের থেকে ফার বেটার লাইফ লিভ করে। খেতে পাক না পাক, কেউ তো ওদের খোঁচায় না, অপমান করে না!

রঞ্জু ধমক দিয়ে উঠল, পাড়ার মধ্যে মাঝরাতে আবার মাতলামি শুরু করেছিস? আলো নিভিয়ে রেখেছে বলে কি ভেবেছিস সবাই ঘুমিয়ে আছে? নির্মলের কানে উঠলে কিন্তু পার্টি থেকে হুড়কো দেবে পেছনে, মনে থাকে যেন!

ওরা আবার হাঁটছিল চুপচাপ।

মোড়ের দোকানগুলোর সব ঝাপ পড়ে গেছে। ডিলাইট সেলুন, গমকল, গজেনের মুদিখানা, কলি ফিরিয়ে এখন নাম হয়েছে 'আপনজন স্টোরস', তারপরেই মাদার ডায়েরির বুথ, শনি-কালী মন্দির– কোথাও কেউ নেই। একমাত্র মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ভেতরেই আলো জ্বলছে। কাউন্টারে বসে রাখাল ঘোষ বোধহয় হিসেব মেলাচ্ছিল, মোড়ের মাথায় দাঁড়ানো ওদের তিনজনকে দেখেও দেখল না সে।

রঞ্জুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বুনো বলল, ও ব্যাটাকে একটু রগড়াবে নাকি, বস? কালীপূজোর চাঁদা নিয়ে কী কিচাইল করেছিল ভুলে গেছ?

রঞ্জু গম্ভীর গলায় বলল, তোর নেশা হয়ে গেছে, বুনো!

বুনো মুখে কথাটার প্রতিবাদ করল না, শুধু ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করল। একটু এগিয়ে বাঁ দিকে একটা অন্ধ গলি, তারপর রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। উত্তরদিক থেকে মৃদু একটা হাওয়া দিচ্ছে এখন, সেই হাওয়াতেই সুভাষের নেশাটা যেন আরও চড়ে যাচ্ছিল, টেনে টেনে বলল, চলি রে! ফির মিলেঙ্গে...

টলতে টলতে বাঁ দিকের গলিতে ঢুকে গেল সুভাষ। বুনো আর রঞ্জু এখন ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোবে। রঞ্জুর বাড়ি ছাড়িয়ে আরও অনেকটা পথ যেতে হবে বুনোকে। শীতলা মন্দিরের সামনে রিকসা স্ট্যান্ডটা ফাঁকা, একটা ভ্যানরিকশার ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে একটা লোক। রঞ্জুর এখন একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। বুনো আপন মনেই কী একটু বিড়বিড় করল, তারপর রাস্তার পাশে উবু হয়ে বসে ওয়াক তুলল বারকয়েক। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে ফের। রঞ্জু বলল, কীরে, শরীর খারাপ করেছে? পারিস না যখন, খেতে যাস কেন? আমি মাইরি তোর সঙ্গে আর মাল খাওয়ার পার্টিতে থাকব না !

মরব না, বস! মাল খেয়ে মরব না কোনওদিন! এই রক্তে কত বিষ আছে জানিস? বিষে বিষ ক্ষয়... শালা আমি যদি ছোবল দিই না সাপ মরে যাবে!

রঞ্জুর বাড়ির গলিটা এসে গেছে, বুনো বলল, টা টা! আবার দেখা হবে! কী বলতে আজ তোর লাভারকে নিয়ে কী বলে ফেলেছি, কিছু মনে করিস না। চলি

ঘুরে সামনের দিকে এগোতে গিয়ে প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিল বুনো, হাত বাড়িয়ে পলকা শরীরটা ঝপ করে ধরে ফেলল, রঞ্জু– চল, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি!

হাত নেড়ে বুনো বলল, লাগবে না। আমি একাই যেতে পারব।

শক্ত করে বুনোর একটা হাত ধরেছে রঞ্জু, ধমকের সুরে বলল, আবার বকবক করবিতো থাবড়া মেরে ড্রেনে ফেলে দিয়ে চলে যাব!

সিকদার বাগানের পুকুরটার ধার দিয়ে হাঁটছিল ওরা। এই অঞ্চলে এই একটাই পুকুর এখনও বেঁচে আছে, বাকি সব বুজিয়ে ফ্ল্যাট উঠে গেছে। একটা এনজিওকে ধরে পাড়টা বাঁধিয়ে নিয়েছে ক্লাবের ছেলেরা। কোনের বাড়িটাই দেবু মল্লিকের বাড়ি। স্ট্রিট লাইটের আলোয় নিঝুম বাড়িটার সামনে নতুন ঝকঝকে সাইনবোর্ডটা দেখতে পেল রঞ্জু। দক্ষিণী কলাকেন্দ্র। দু-একদিনের মধ্যেই বোধ হয় লাগানো হয়েছে সাইনবোর্ডটা। ঋতুর মায়ের মুখখানা একবার মনে পড়ল রঞ্জুর। ভদ্রমহিলার সাজগোজ একটু উগ্র ধরনের হলেও ওর চেহারায় কোথায় যেন একটা বিষাদের ছোঁয়া আছে। প্রথম সাক্ষাতের দিনই কথাটা মনে হয়েছিল রঞ্জুর। ওই অন্ধকার বাড়িটার কোন একটা ঘরে ঋতু নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে এখন। ভাবতে গিয়ে ভারি অদ্ভুত একটা অনুভব যেন বুকের ভেতর নড়েচড়ে উঠল।

সামনের বাঁকটা ঘুরলেই বুনোর বাড়ি দেখা যাবে। রঞ্জু মনে মনে ঠিক করে ফেলল সে অতদূর যাবে না, বুনোকে বাঁকের কাছ পৌঁছে দিয়েই সে ফিরে যাবে। দরজায় টোকা দেয়া মাত্র বুনোর মা এসে কপাট খুলে দাঁড়াবে। তাঁর অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টির মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করছে না রঞ্জুর।

আবার রাস্তার মাঝখানে বসে পড়েছে বুনো। এবার আর ওয়াস তুলল না, হাউমাউ করে কেদেঁ উঠল– আজকে আমি একটা পাপ করে ফেলেছি, বস! আমাকে মাফ কর দিস! তোদের মিথ্যে বলেছি, নির্মলদা আজ মাইনে দেয়নি। ওর ব্যাগ থেকে দুটো পাত্তি ঝেড়েছি আজ!

কী বললি? চুরি করেছিশ? রঞ্জু বললো।

অঝোরে কেঁদে চলেছে বুনো। সমস্ত শরীর ঘৃণায় আক্রোশে থর থর করে কাঁপছিল রঞ্জুর। চুরির টাকায় আজ মাল খেতে হল তাকে? গলায় আঙুল দিয়ে ভেতরে যা কিছু আছে সব তুলে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। ঋতুর নিষ্পাপ সরল মুখখানা তারা ভরা আকাশের ঠিক মাঝখানে একবার বুঝি দেখতে পেল সে। প্রস্তর যুগের কোনও প্রাণীর মতো আদিম অবোধ্য ভাষায় বুনো কী সব বলছিল, তীব্র এক পদাঘাতে তাকে উড়িয়ে দিতে গিয়েও দিল না রঞ্জু।

মাথা নিচু করে ফিরে যাচ্ছিল সে।

॥ পাঁচ ॥

একদিন শীতের এক সকালে লোকটা এল। বাস থেকে নেমে উদাস দৃষ্টিতে চার দিকটা দেখছিল। লম্বা একহারা চেহারা, গায়ের ফর্সা রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে এসেছে, একমুখ দাড়িগোঁফ মাথায় কাঁচাপাকা কোঁকড়ানো চুল, চোখের মণি দুটি কটা– সকালবেলায় শীতের সোনালী রোদে লোকটাকে সন্ন্যাসীদের মতো দেখাচ্ছিল।

আজ দিনটাও ভারি সুন্দর। এখন এই সকাল দশটায় সোনালি আলোর প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। গাঢ় নীল আকাশে দু'এক টুকরো মেঘ, ঝিম হাওয়ার ভেতরে দু-চারটে শালিক কি চড় ই-এর ওড়াউড়ি, নানা রঙের কার্ডিগানপরা মায়েরা শিশুদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলবাসের জন্য। এমনকি বাসস্টেশনের ছাউনির নিচে দাঁড়ানো অফিস যাত্রীদেরও আজ তেমন তাড়া নেই যেন। সাদা স্কুল-ইউনিফর্ম পরা ছ-সাতটি মেয়ে রাজহাঁসের মতো চলে যাচ্ছিল ফুটপাথ ধরে।

কলকতায় এক একটা দিন এরকম আসে যখন বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরকে 'থ্যাংক ইউ' বলতে ইচ্ছে করে।

লোকটার পরনে আধময়লা ধুতিপাঞ্জাবি, গায়ে ছাইরঙের একটা শাল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মানুষটার কোন ব্যস্ততা নেই! কী ভেবে পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে চশমা বের করে পরল, তারপর কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে

একখানা চিরকুট বের করে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। না কোনও ভুল হয়নি, ঠিক জায়গাতেই এসেছে। আশপাশের কেউ লক্ষ্য করল না– বিচিত্র একটা হাসির আভাস লোকটার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। চিরকুটখানা পাঞ্জাবির বুকপকেটে রাখল সে।

ধীরে পায় পাড়ার রাস্তায় ঢুকল লোকটা। রাস্তার দুধারে বাড়িগুলোর নম্বর দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল। বহুকাল আগে কলকতার দক্ষিণতম প্রান্তে এ অঞ্চলটায় কাজে কাজে দু-একবার আসা হয়েছিল, এখন সবই কেমন অচেনা লাগছে। চারদিকে এত বাড়িঘর হয়ে গেছে, পুরনো ছবিটার সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। তবু লোকটার খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করারও দরকার হচ্ছে না। ডানদিকে সবুজ সং-এর খেলার মাঠটা ছাড়িয়ে সোঝা এগিয়ে যাচ্ছিল। মোড়ের মাথায় মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে এসে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। প্রথম যখন এসেছিল তখও বোধহয় ছিল এ দোকানটা। মাদার ডেয়ারির বুথটা অবশ্য তখন থাকবার কথা নয়। ডানদিকের গলিতে ঢোকবার সময় লোকটা ভাবছিল।

'দক্ষিণী কলাকেন্দ্র'-র সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। বয়স হয়েছে, এতটা পথ হেঁটে এসে একটু হাঁপাচ্ছে এখন। এই শীতের সকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। নিশ্চিত হবার জন্য বুকপকেট থেকে ফের চিরকুট খানা বের করে সাইনবোর্ডের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে নিল। তারপর গেট ঠেলে ভেতরের ঢুকে সদরের কড়া নাড়ল। এতক্ষণ পর যেন লোকটার উদাসভাব কেটে যাচ্ছে, চোখেমুখে একটা টেনশনের ছাপ ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, দ্বিতীয়বার কড়া নাড়বার আগে লোকটা পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিল।

ঋতু এসে দরজা খুলে দিয়েছে।

আজ একটু বেলায় কলেজে বেরোবে বলে এখনও চান হয়নি। চুল এলোমেলো। নন্দিতা এখন রান্নাঘরে খুটখাট করছে। ঠিকে ঝিকে কী সব বোঝাচ্ছিল। ছুটে দরজা খুলতে আসার সময় ওড়না আনতেও ভুলে গেছে সে।

তোমার মা আছেন? লোকটা বলল।

ঋতু অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। গলার স্বরটা চেনাচেনা লাগছে, চোখের দৃষ্টিও যেন কত জন্মের চেনা। তৃষিতের মতো লোকটা ঋতুকে আপাদমস্তক দেখছিল। বয়স্ক লোক, দৃষ্টিতে স্নেহ ছাড়াও কেমন একটা পাগলপারা ভাব আছে, ঋতুর গা শিরশির করে উঠল। সম্পূর্ণ অচেনা একটা লোককে ভেতরে আসতে বলবে কিনা ঋতু ঠিক বুঝতে পারছিল না, কী ভেবে বলল আপনি একটু দাঁড়ান মাকে ডেকে দিচ্ছি।

কদিন ধরেই বিশ্রী একটা কাশি হয়েছে প্রণবের। খুশ খুশে কশি, কাল সারারাত খুব কষ্ট পেয়েছেন। আজ সকালে চা-খাবার পর একটু আদাকুঁচি দিয়েছিল নন্দিতা, তাইতেই কাশিটা কম আছে। তক্তপোশে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন এতক্ষণ, ঋতুর গলা পেয়ে পাশ না ফিরেই বললেন, কে এল রে ঋতু?

ভেতর বারান্দার দিকে যাবার সময় গলা নামিয়ে ঋতু বলল, চিনি না! সদরে কড়ানাড়ার শব্দ নন্দিতা রান্নাঘর থেকেই পেয়েছিল। ঋতুকে দেখতে পেয়ে কিছু বলার আগেই ঋতু বলল, তোমাকে ডাকছেন এক ভদ্রলোক। নন্দিতা অবাক হল না। 'দক্ষিণী কলাকেন্দ্র'র ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কুড়ি ক্রস করে যাবার পর প্রায়ই খোঁজখবর করতে নানারকম লোকজন আসে তার কাছে। অবশ্য নির্মল সেনগুপ্ত পেছনে না থাকলে এত অল্প সময়ের মধ্যে 'দক্ষিণী কলাকেন্দ্র' এত রমরমা হতে পারত না। ইদানীং এ বাড়িতে নির্মলের যাতায়াতও বেড়ে গেছে। প্রায়ই রাতে সাইবার কাফে বন্ধ করে ঘরে ফেরার সময় একবার উঁকি দিয়ে যায়। মুখে নানারকম কাজের কথাই বলে নির্মল, তবু পুরুষের দৃষ্টি চিনতে ভুল হয়না নন্দিতার। অমিত কিরনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর থেকে কম পুরুষ তো দেখা হল না!

বলতেই নেই, নির্মলের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেক সাহায্যই করেছে সে। নন্দিতা যখন পাগলের মতো বাড়ি খুঁজছিল, তখন কোনও রকম অ্যাডভান্স ছাড়া এই বাড়িটার ব্যবস্থা নির্মলই করে

দিয়েছিল। খুব শিগগির সাইবার কাফে থেকে জেরক্সের পাট তুলে দিতে চলেছে নির্মল। সেখানে একটা বুটিকের দোকান খুলে নন্দিতাকে পার্টনার করে নিতে চেয়েছে সে। নির্মলের সঙ্গে এই মাখামাখিটা পাড়ার অনেকেই যে ভাল চোখে দেখছে না– সেকথা অবশ্য নন্দিতা জানে। ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিচ্ছে না নন্দিতা। পাত্তা দিলে তার চলবে না। তবে নির্মল কী করে তার প্রাপ্য বুঝে নেয়– সেটাই এখন দেখার। সত্যি বলতে কি একটু আশঙ্কার মধ্যেই আছে সে।

আসলে কলকাতার একেবারে শেষে প্রান্তে এই দক্ষিণ শহরতলিতে এসে একটু নিশ্চিন্তই বোধ করছে নন্দিতা। এসব পাড়ায় এখনও একটু গেঁয়ো ভাব রয়ে গেছে। সাধারণ গেরস্তঘরের মতো জীবনযাপন না হলেই এখানে নিন্দে-মন্দ রট নেই– তাতে গা না করলেই হল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সদর দরজার কাছে এসেই পাথর হয়ে গেল নন্দিতা, অস্ফুট স্বরে বলল, আপনি? আবার এসেছেন?

লজ্জিতভাবে লোকটা একটু হাসল। বলল, অনক কষ্টে তোমার ঠিকানা জোগাড় করতে পেরেছি। তোমার ঢাকুরিয়ার বাড়িওয়ালাই দিয়েছে ঠিকানাটা। লোকটা ভীষণ লোভী, বলেছিল কিছু খরচা দিতে হবে। দিলাম। তুমি বোধ হয় বারণ করে এসেছিলে...

চকিতে একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিল নন্দিতা. প্রণব এখনও দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে, লোকটার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। চাপা হিংস্র স্বরে নন্দিতা বলল, শয়তান!

লোকটার কোনও ভাবান্তর হল না তাতে, আগের মতোই হাসি হাসি মুখে বলল, ভেতরে আসতে বলবে না? তোমাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না, মেয়ের সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে যাব।

নন্দিতা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রাগে ঘৃণায় তার ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে বলে, প্রতাপ, কী চাও তুমি আমার কাছে? কেন প্রায় এক যুগ ধরে ছায়ার মতো আমাকে অনুরণ করে চলেছে? কেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কলকতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে? আমার যে সর্বনাশ একদিন তুমি করেছিল, সে কথা আমি ভুলে যেতে চাই, প্রতাপ! প্লিজ গেট লস্ট! ঠোঁট অল্প কাঁপছে, চোখদুটি পাথরের মতো ভারী অথচ শুকনো, নন্দিতার মুখে কোন কথা ফুটল না।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দ্রুত ত্রস্তপায়ে ভেতরের ঘরে এল নন্দিতা। প্রতাপের কোন বিকার নেই, সে-ও পেছন পেছন। ঋতুর সাড়াশব্দ নেই। বোধ হয় কাজে ঢুকেছে। ঘরে এসে ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ছে নন্দিতা। প্রতাপ কৌতুহলি চোখে ঘরে আসবাবপত্র দেখছিল। সবই চেনা। বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পাওয়া জোড়াখাট, স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল, আলনা– অমিত কিরণ চায়নি কিছুই, নন্দিতার বাবা নিজে থেকেই দিয়েছিল সব।

বিয়ের পর প্রথম ভাড়াবাড়ি দেশবন্ধু পার্কে, দু-বন্ধু কত ঘোরাঘুরি করে দালাল ধরে বাড়িটা পেয়েছিল নন্দিতা কি জানে সব? নতুন বাড়িতে ঘর সাজানোটা অবশ্য নন্দিতা নিজের চোখেই দেখেছিল। খুবই মুখচোরা টাইপের মানুষ ছিল অমিতকিরণ, কাঁচড়াপাড়ায় যখন স্কুলে পড়ত, তখন থেকেই প্রতাপ ছাড়া কোন বন্ধু ছিল না তার। সে-ও বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। দু-বন্ধু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। চেহারাও এতই আলাদা, একসঙ্গে বেরোলে রীতিমতো চোখে পড়ত। অমিতকিরণ রোগা, প্রতাপের তুলনায় বেটেই বলা যায়, কালো, প্রায়ই একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। আর প্রতাপ তখন স্কুল টিমের ডাকসাঁইটে খেলোয়াড়, কত দূরে দূরে ম্যাচ খেলতে যেত।

দেশবন্ধু পার্কের বাড়িতে প্রথম দুটো বছর খুব আনন্দেই কেটেছিল। দুজন তো নয়, সংসারটা ছিল আসলে তিনজনের। কোল ইন্ডিয়ায় চাকরি ছিল প্রতাপের, ডালহাউসিতে অফিস। কাঁচড়াপাড়ার পৈতৃক বাড়ি থেকেই ডেলি-পেসেঞ্জারি করত। অফিস ছুটির পর প্রায় রোজই আসত। বিয়ে-থা করেনি, ভায়েদের সংসারে থাকত বলে বাড়ির টানও ছিল। প্রথম দুবছরে ওদের দারজিলিং দীঘা পুরী আর ভাইজাগ বেড়ানো হয়ে গেছে। প্রতাপকে সঙ্গে না নিয়ে বাইরে বেরোবার কথা কল্পনাই করতে পারত না অমিতকিরণ। টিকিট কাটা, হোটেল

বুকিং থেকে শুরু করে ভ্রমণের যাবতীয় পরিকল্পনা প্রতাপ করত। অমিতকিরণের কাজ ছিল শুধু মাথা নেড়ে সায় দেয়া।

নন্দিতার মনে খটকাটা লেগেছিল তৃতীয় বছরে, যখন একটি সন্তানের জন্য মনপ্রাণ ধীরে ধীরে আকুল হয়ে উঠছিল। এমন কিছু কচি বয়সে বিয়ে হয়নি নন্দিতার, ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। অমিতকিরণের চৌত্রিশ। ঠারেঠোরো কথাটা অনেকবার অমিতকিরণকে বলবার চেষ্টা করেও যখন কাজ হল না, তখন একদিন রাতে শোবার সময় সরাসরিই নন্দিতা বলেছিল, জান, আজ বাড়িওলার বউ জিজ্ঞেস করছিল একটা কথা!

ঘুমচোখে অমিতকিরণ বলেছিল, কী?

একটুখানি ইতস্তত করে নন্দিতা বলেছিল, বউটার মুখে কিছু আটকায় না! আঃ কী বলছিল বল না!

অমিতকিরণের বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে নন্দিতা বলেছিল,বউটা বলল, টোনাটুনিতে আর কত এনজয় করবে? এবার ছেলেপুলে হোক!

হাঠাৎই ঘুমঘোর কেটে গিয়ে কেমন সচকিত হয়ে উঠেছিল অমিতকিরণ। বিছানায় উঠে বসে প্রায় জেরা করার ভঙ্গিতে বলল, তুমি কী বললে?

অবাক হয়ে নন্দিতা বলেছিল, বাঃ আমি আবার কী বলব? বয়স্ক মহিলা যায় নাকি কিছু বলা? এক ছুটে পালিয়ে এলাম!

তুচ্ছ একটা ব্যাপার, নন্দিতা আজও ভোলেনি। তাহলে কি অমিতকিরণের সন্দেহ ছিল সে শারীরিকভাবে অক্ষম, কোনদিনই বাবা হতে পারবে না? গোপনে ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়েছিল। এসব তথ্য আর জানবার উপায় নেই। ওই সময়ই একদিন ঘটনাটা ঘটল। প্রতাপ এল এক দুপুরে, ধুম জ্বর নিয়ে অমিতকিরণ তখন অফিসে।

প্রতাপের চোখদুটি লাল, এসেই বলল, অফিসে এসে শরীরটা খুব খারাপ করেছে বলে চলে এলাম তোমার এখানে! আর দাঁড়াতে পারছি না, একটু শুয়ে পড়ছি। বলে বাইরের ঘরের তক্তপোশেই শুয়ে পড়েছিল প্রতাপ।

কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠেছিল নন্দিতা। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। জ্বরের ঘোরে বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছে। কী করবে ভেবে না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে একটা ওষুধের দোকান থেকে অমিতকিরণকে ফোন করেছিল।

এক ঘণ্টার মধ্যে অমিতকিরণ এল ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে। রোগী দেখে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তারের। রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়ল ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। টানা পনের দিন লেগেছিল সুস্থ হতে। অমিতকিরণ বোধ হয় ওর বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছিল ব্যাপারটা। আশ্চর্যের বিষয় এই কাঁচড়াপাড়ার বাড়ি থেকে কেউ একবার খোঁজও করতে আসেনি।

প্রতাপ যেদিন কাচড়াপাড়ায় ফিরে যাবে ঠিক করল, তার আগের দিন দুপুরে ঘটল ঘটনাটা। খাওয়াদাওয়ার পর ভেতরের ঘরে একটা গল্পের বই নিয়ে বাসেছিল নন্দিতা। দরজার কাছে এসে প্রতাপ বলল– ভেতরে আসব?

আসুন! বলে একটু অস্বস্তিও হয়েছিল নন্দিতার। অমিতকিরণ অফিসে, বাইরে নিঝুম দুপুর। আঁচল ঠিক কর বেছানার কোণে গুছিয়ে বসতে গিয়ে বুক ধুঁকপুক করে উঠেছিল। ঘরে ঢুকে নন্দিতার খুব কাছে এসে দাঁড়াল প্রতাপ। ফিসফিস করে বলল– কালই সকালের ট্রেনে কাছড়াপাড়ায় ফিরে যাব ভাবছি। কাল থেকে আর জ্বর আসেনি...।

প্রতাপের গলায় কী যেন ছিল। নন্দিতার সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে উঠেছিল। নিজেকে প্রাণপণে সামলে নিয়ে সে বলেছিল, এখনও তো পুরো সুস্থ হননি, আরও কটা দিন থেকেই যান। প্রতাপ বলল, এ ক'দিন তুমি আমার জন্য যা করেছ তার প্রতিদান নেবে না? প্রতাপের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক, চোখের দৃষ্টিতে অস্থিরতা।

কথাটা ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই প্রতাপ যেন এক দুরন্ত ঝড়ের মতো উঠে এল নন্দিতার শরীরে। নন্দিতা অস্বীকার করতে পারবে না। এত আনন্দ আর এত যাতনা একসঙ্গে এর আগে কখনও অনুভব করেনি সে।

এর কিছুদিন পরই সমস্ত শরীর জুড়ে আর একটা প্রাণের আনন্দ তৈরি হল। খবরটা শুনে অমিতকিরণের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা ভাল করে খেয়াল করার কথাও মনে হয়নি নন্দিতার। তখন থেকেই কি অমিতকিরণ একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছিল? তা-ও লক্ষ্য করেনি সে, মা হওয়ার গভীর এক আনন্দের মধ্যে ডুবে ছিল নন্দিতা। নার্সিং হোমের বেবিকটে শোওয়ানো মেয়ের কটা চোখের মণিদুটি দেখে কোনও সন্দেহ হয়েছিল কি অমিতকিরণের? কিছুই জানবার উপায় নেই এখন আর। মেয়ে যত বড় হচ্ছিল। ততই যেন আরও চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল অমিতকিরণ। প্রতাপ আসত নিয়মিত। তবে আগের মতো আড্ডা হত না, নন্দিতাও মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। না, প্রতাপ আর কোনও দিন নন্দিতার কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করেনি। একদিন শুধু গোপনে বলেছিল, ও কিন্তু আমার মেয়ে।

অমিতকিরণের কোনদিন সন্দেহ হয়েছিল কিনা বুঝতে দেয়নি নন্দিতাকে। একদিন নিঃশব্দে ঝুলে পড়েছিল পকেটের ভাঁজকরা কাগজে লেখা ছিল 'বেঁচে থাকতে আর ভাল লাগছে না বলেই এই পথ বেছে নিলাম। আমার মুত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' কেন একথা লিখেছিল সে? সে কি শুধু নন্দিতাকে বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য? নাকি প্রতাপকে আর সহ্য করতে পারছিল না। বলে?

অমিতকিরণের মৃত্যুর পর প্রতাপের ঘন ঘন যাতায়াতটা আর ভাল লাগছিল না নন্দিতার। তাছাড়া মেয়েও বড় হচ্ছে ধীরে। প্রতাপের পাগলপাড়া ভাবটাও বাড়ছিল। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই দু-দিনের নোটিশে গ্রে-ট্রিস্টের বাড়িতে উঠে এসেছিল। প্রতাপ কী একটা কাজে আসানসোল গিয়েছিল, ফিরে এসে নন্দিতার নতুন আস্তানা খুঁজে বের করাতে অবশ্য খুব একটা সময় লাগেনি তার। সেখানেও আসতে শুরু করল নিয়মিত। ঋতুকে মাঝে মাঝে এমন করে আদর করত, খুব অস্বস্তি হত নন্দিতার। বাড়িওয়ালির বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল। বোনপো শিলিগুড়ি থেকে বদলি হয়ে এসে ওখানে থাকবে বলে নোটিশ দিয়ে বসল।

তারপর ঢাকুরিয়া। ঢাকুরিয়ার বাড়িটা খোঁজ পেতে একটু সময় লেগেছিল প্রতাপের। এক রোববারে ঠিক এসে উপস্থিত হল। ভাগিস ঋতু সেদিন বাড়ি ছিল না। সেলিমপুরে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। মেয়েকে দেখবার জন্য আর একদিন আসবে বলে উঠেছিল নন্দিতা আর দেরি করেনি, তার পরদিন থেকেই বাড়ি খুঁজতে শুরু করেছিল। পাগলের মতো।

খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতাপ, একটা শ্বাস ফেলে বলল, আমার কাছ থেকে মেয়েকে আড়াল করে রাখতে চাও কেন তুমি? কী লাভ? অবুঝের মতো নন্দিতা বলল, আপনাকে তো কতবার বলেছি, একটা মিথ্যে বিশ্বাস নিয়ে আছেন আপনি। ঋতু আপনার মেয়ে নয়।

উদাস গলায় প্রতাপ বলল, সেটা তুমি আমার চাইতে আরও ভাল করে জানবে। মিথ্যে হোক সত্যি হোক আমার বিশ্বাসটকে তুমি কী করে নষ্ট করবে? নন্দিতার মুখ বিকৃত হয়ে আসছিল ঘৃণায়। সে বলতে যাচ্ছিল আমার সমস্ত জীবনটা আপনি ছারখার করে দিয়েছেন, এবার আমাকে মুক্তি দিন! প্লিজ! কিন্তু তার আগেই দরজার কাছে ঋতুর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকে প্রতাপকে দেখে অবাক হয়ে গেছে ঋতু। নন্দিতার মুখ থমথমে। একটু হেসে প্রতাপ বলল, আমাকে চিনতে পারোনি? আপি প্রতাপ কাকু! লজ্জা পেয়েছে ঋতু। এইমাত্র চান সেরে চুল পাট করবে বলে ঘরে ঢুকেছে সে। স্মৃতির ভেতরে অস্পষ্ট একটা মুখের আদল ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে সবটুকু হচ্ছেও না। কী ভেবে একটু এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে মানুষটাকে প্রণাম করল ঋতু, মাথায় হাত রেখে প্রতাপ গভীর ভরাট গলায় বলল বেঁচে থাকো! খুব বেশিক্ষণ থাকল না প্রতাপ। বসলও না। ঋতুর সঙ্গে দু-চারটে মমুলি কথাবার্তা বলে চলে গেলো। যাবার সময় নন্দিতাকে বলে গেল, কোন দরকার পড়লে ডেকো। মাঝে মাঝে তোমাকে বিরক্ত করতে আসব।

একটা ফোন নম্বরও দিয়ে গেল। ঠোঁটদুটি ফুলে উঠেছে নন্দিতার। এভার সে আর বইতে পারছে না। এর চাইতে সত্যের মুখোমুখি হওয়াই বোধ হয় ভাল।

দুপুর থেকেই মেঘ জমছিল আকাশে।

অকালের মেঘ, বৃষ্টি হবে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না তখন। এখন এই শেষ বিকেলে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো। কলকাতার তাপমাত্রা হঠাৎ করেই যেন কয়েক ডিগ্রি নেমে গেছে। রাস্তায় লোকজন কম, চাদরমুড়ি দেয়া কয়েকজন দরিদ্রশ্রেণীর লোক বাসস্টেশনের ঝুপড়ি চায়ের দোকানে কয়লার উনুন ঘিরে দাঁড়িয়ে হাত সেঁকছিল। তবে বৃষ্টি নেই। হাওয়ায় ভিজে ভাবও নেই।

বাস থেকে নেমেই উল্টোদিকের ফুটপাতে রঞ্জুকে দেখতে পেল ঋতু। এই কনকনে ঠাণ্ডাতেও শুধুই একটা টি-শার্ট গায়ে। সেই উদভ্রান্ত চেহারা,এলোমেলো চুল উদাস চোখের দৃষ্টি। ওর কি শীতের বোধ নেই? ইদানীং যাওয়া আসার পথেই মাঝে মাঝে দেখা হয়, দু'একটা মামুলি কাথাবার্তাও হয়। রঞ্জু যে তাকে এড়িয়ে যেতে চায় সেটা বুঝতে পারে ঋতু। কিন্তু কেন? এখন হঠাৎই একটা জেদ পেয়ে বসল ঋতুকে, হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকল সে, রঞ্জুদা!

ফুটপাত ধরে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল রঞ্জু, ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল। একটা বাস এবং তার পেছনে একটা অটোকে যেতে দিয়ে রাস্তা পেরোল ঋতু, রঞ্জুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে বলল, এই ঠাণ্ডায় শীতের জামা না পরে বেরিয়েছ?

রঞ্জুর সত্যিই যেন কোনও শীতের বোধ নেই, অবাক হয়ে বলল, কই, আমার তো তেমন শীত করছে না!

তুমি একটা পাগল! কোথায় যাচ্ছিলে বল তো?

ম্লান হেসে রঞ্জু বলল, এই এমনি একটু হাঁটছিলাম। তুমি?

কলেজ থেকে ফিরছি। দেখ না কি কাণ্ড, আজ এই ওয়েদারেও সব ক'টা ক্লাস হল।

তাই বুঝি?

বলে চুপ করে গেল রঞ্জু। ঋতু কলেজের গল্প শুরু করেছে। ছুটির পরে আজ কোন বন্ধুর বাড়ি যাবার কথা ছিল, হয়নি। রঞ্জু একদিন সময় করে ওর সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটে যাবে কিনা, কয়েকটা বই কেনবার আছে। কাজের কথা, আবার কাজের নয়ও। এই মেয়েটির বকবক শুনতে তার ভালই লাগে, তবে সে নিজে মেয়েদের সঙ্গে গুছিয়ে কথা বলতে শেখেনি বলে চুপ করেই থাকে। বুটিকের কাজ করা চুড়িদারের ওপর টকটকে লাল একটা কার্ডিগান পরেছে ঋতু, হাওয়ায় চুল উড়ছিল। শেষ বিকেলের আকাশ থেকে সব মুগ্ধকারী আলো এসে পড়েছে এখন ঋতুর মুখে, ও মেয়ে কি জানে কি অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে?

আজ কিছুদিন হল মনে অদ্ভুত এক গ্লানি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রঞ্জু। কলিকাতা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে তার কাছে। বন্ধুদের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। বুনো আর সুভাষ মাঝে মাঝে বাড়ি বয়ে ডাকতে আসে, ঘরে থেকেও সাড়া দেয় না। অকারণ এক ক্রোধে ভেতরটা সব সময় জ্বালা জ্বালা করে। এসপ্ল্যানেডে, নন্দন চত্বরে একটা উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণাপনের সামনে সিঁড়িতে গিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। ওসব জায়গায় কেউ তাকে চেনে না, কেউ এসে পিঠে হাত রেখে বলবে না, গুরু, মাল খাবি?

ঋতুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরের দিকে তাকায় রঞ্জু। খুব বেশি দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও এই মেয়েটির সঙ্গে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার, রঞ্জু অনুভব করে। এক এক সময় তার খুব বলতে ইচ্ছে করে, আমার সঙ্গে মিশ না, ঋতু। আমি ভাল নই। মনে মনে অনেকবার রিহিয়ার্সাল করেও বলা হয় না কথাগুলো।

ঋতু তার অসম্ভব সুন্দর আঙুল তুলে নির্দেশের ভঙ্গিতে বলল, চল তো, এই ঠাণ্ডায় কোথাও ঘুরতে যেতে হবে না। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে, চল।

পাড়ার পথ ধরে দু'জনে এগোয়। ঋতুর শরীরের ঘ্রাণ– নাকি যে অচেনা ফুল কোনও দিন চোখে দেখা হয়নি তার ঘ্রাণ– বুক ভরে টেনে নেয় রঞ্জু।

‘দক্ষিণী কলাকেন্দ্র’র সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। দরজা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে, ঋতু বলে, ভেতরে যাবে না?

রঞ্জু বলে, না। আজ থাক।

শাসনের ভঙ্গিতে ঋতু বলে, সোজা বাড়ি যাবে কিন্তু, ঠাণ্ডায় বাইরে ঘোরাঘুরি করবে না!

রঞ্জু ফিরে যাচ্ছিল। ঘরে ঢুকে ঋতু দেখল বেশ ক’দিন পর বিছানায় উঠে বসেছেন প্রণব দাদু। কাগজ পড়ছিলেন আলো জ্বেলে। সদর খোলা পেয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকেছে ঋতু। শোবার ঘরে এসে দেখল খোলা জানালার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে আছে নন্দিতা। ঋতুর মায়ের আওয়াজ পেয়েছে বোধহয়, থমথমে গলায় ডাকল, ঋতু, এদিকে এসো!

ঋতু অবাক হয়েছে। হাতের ব্যাগ বিছানায় নামিয়ে রেখে সামনে আসে। ঘরে আলো জ্বালানো হয়নি, বাইরের সামান্য আলোয় ঋতু দেখল নন্দিতার চোখের পাতা দুটি ভেজা। নিজের সঙ্গে নিজে বোঝাপড়া করতে গেলে মানুষের এরকম চেহারা হয়।

আঁচলে চোখ মুছে নন্দিতা বলল, তুমি বড় হয়েছ, ক’দিন থেকেই একটা কথা তোমাকে জানানো প্রয়োজন বলে আমার মনে হচ্ছে।

মায়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ঋতু, নন্দিতার গলার স্বর এখন সম্পূর্ণ অচেনা মনে হচ্ছে।

শান্ত গলায় নন্দিতা বলল, ক’দিন আগে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তোমার মনে পড়ছে কি?

হ্যাঁ। প্রতাপ কাকু।

কাকু নন, উনিই তোমার বাবা। তোমার কাছে এতদিন ব্যাপারটা গোপন করে রেখেছিলাম, আর বোধহয় তার প্রয়োজন নেই।

ঋতুর মাথা ঝিমঝিম করছে, যেন ভয়ঙ্কর এক ধাক্কায় পরিচিত পৃথিবীটা উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। খাটের বাজু ধরে বিছানায় বসে পড়তে পড়তে বলল, কি যা-তা বলছ?

ঠিকই বলছি!

নন্দিতার গলায় কোনও দ্বিধা নেই। চকিতে একবার যেন ঝুলন্ত একটা শরীর দেখতে পেল ঋতু, হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। পরনে ধোওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি। সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এতদিন তার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যে মানুষটা, স্কুল-কলেজের সব সার্টিফিকেটে যার নাম গোটা গোটা হরফে লেখা রয়েছে– নন্দিতার এক ফুৎকারে যেন উড়ে গেল সে।

মাথার ভেতরটা, ধোঁয়া ধোঁয়া, একটা বালিশ আঁকড়ে ধরেছে ঋতু। নন্দিতার কোনও বিকার নেই। বাইরে গাঢ় হয়ে অন্ধকার নামছে। অমিতকিরণের আত্মহত্যার কারণটা একটু একটু বুঝতে পারছে ঋতু। চেয়ারে বসে থাকা ওই মহিলাকে এখন প্রকৃত খুনির মতোই দেখাচ্ছে।

বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল ঋতু।

॥ ছয় ॥

রঞ্জু বাবু! রঞ্জু বাবু কি ঘরে আছ?

ভর দুপুর বেলায় বন্ধ জানালার কাছে এসে লোকটা ডাকছিল। লোকটা মানে কৃষ্ণদয়াল। প্রায়ই নাকি আসে, সুখি বলছিল। গা’টা একটু ম্যাজম্যাজ করছিল বলে সকালে ঘর থেকে বেরোয়নি। দুপুরে খাবার পর ঘুম এল,

ঠিক তখনই ওই ডাক। লোকটা আসলে মুখ-চেনা। বাসস্টপের চায়ের দোকানে আলাপ হয়েছিল। একটা গায়েপড়া স্বভাবের মানুষ, কারণে অকারণে রঞ্জু বাবু রঞ্জু বাবু করে।

কৃষ্ণদয়ালের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। মাথা-জোড়া টাক, গোলচাঁদের গোঁফহীন মুখে সব সময় একটা হাসি লেগেই আছে। গলায় তুলসীমালা আছে, খাঁটি বৈষ্ণব হওয়াই সম্ভব। গত বছর দুয়েক ধরে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে এ পাড়ায়। বাড়ির দালালি করে, থাকে গড়িয়া খালের ধারে, বস্তিতে। একদিন কথায় কথায় বলেছিল, ওর দেশের বাড়ি মুর্শিদাবাদে। পলাশির পরের স্টেশনে নামতে হয়, তারপর হয় পায়দল অথবা ভ্যান-রিকশা।

প্রথম দু'টো ডাকে সাড়া দিল না রঞ্জু, তৃতীয় ডাকটা শুনে একটু মায়া হল। বিছানায় উঠে বসে বলল, কৃষ্ণদয়ালদা নাকি? দরজা ভেজানো আছে, ভেতরে চলে এসো।

কৃষ্ণদয়াল সাইকেল নিয়ে এসেছে, সাইকেল টেনে এনে দরজার কাছে দাঁড় করানোর শব্দ পেল রঞ্জু। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে একগাল হাসল কৃষ্ণদয়াল, লজ্জিতভাবে বলল, ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

না।

অসময়ে এসে বড্ড ডিসটার্ব করি তোমাকে। কি করব বল? পেটের দায় বলে কথা, একার তো নয়, বলতে পারো কুড়ি-বাইশ জনের একান্নবর্তী সংসার।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে রঞ্জুর পড়ার টেবিল থেকে হাতল ছাড়া কাঠের চেয়ারটা টেনে মুখোমুখি বসল কৃষ্ণদয়াল। কৌতূহলী গলায় রঞ্জু বলল, তুমি তো শুনেছি বিয়ে-থা করনি!

না করলেও আমার পুষ্যি অনেক।

মানে?

মরার সময় বাপ বিঘে দশেক জমি রেখে গিয়েছিল। সিরাজুদ্দৌলার আমলের একখানা বাড়ি, আমবাগান, পুকুর। বিয়ে-থা করবার ইচ্ছে ছিল না। ভাইবোনও কেউ নেই। বাপ মারা যাবার পর সাতভূতে লুটেপুটে খাবার উপক্রম, তো তখন ঠিক করলাম ক'ঘর রিফুজি এনে বসাব। গাঁয়ের লোকের আপত্তি শুনলাম না, শালদা থেকে ধরে এনে ক'ঘর রিফুজি বসালাম। খুব পরিশ্রমী ছিল মানুষগুলো। ক'মাসের মধ্যেই বাড়ির শ্রী ফিরে গেল। খেতে সোনা ফলতে শুরু করল। আমের বাগানে আম উপচে পড়ে প্রায়। একটা কো-অপারেটিভ তৈরী করে দিলাম। হাঁস-মুরগির পোলট্রি হল। গরু, ছাগল। চল একবার, তোমাকে দেখিয়ে আনব সব। খাঁটি দুধ আর পুকুরের মাছ খেতে কেমন লাগে দেখবে।

দেখিয়ে আর আনবে কেন? গেলে থেকেই যাব তোমার ওখানে, মাঠে কাজ করব, পোলট্রি দেখাশুনা করব।

জিব কেটে কৃষ্ণদয়াল বলল, ছি ছি, ওসব বলো না! তোমরা কলকাতার লেখাপড়া জানা ছেলে, ওসব অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে একদিন দু'দিন ভাল লাগবে, তারপরই পালাই পালাই করবে!

তা তুমি এসব দালালির কাজে এলে কেন?

কী করব? কিছু তো একটা করতে হবে! বোসবাবু আমাদের পলাশির লোক। একদিন বললেন, কেস্ট, চলে আয় কলকাতায়, আমার কনস্ট্রাকশন ফার্মের হয়ে কাজ করবি, ভাল কমিশন পাবি। চলে এলাম। যা পাই কো-অপারেটিভকেই দেই।

লোকটার সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যাচ্ছিল রঞ্জুর। কোন মানুষের ভেতরে যে কী থাকে বাইরে থেকে বুঝে কার সাধ্য? ভেতরের দরজার দিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কৃষ্ণদয়াল, তারপর যেন খুব একটা গোপন কথা বলছে এমন করে গলা নামিয়ে বলল, বড়দি অফিসে বেরিয়ে গেছে?

হুম।

কিছু হল কথাটথা?

কৃষ্ণদয়ালের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকাল রঞ্জু। নতুন করে যেন মানুষটার সঙ্গে পরিচয় হল আজ। বাড়ি-জমির দালাল, নিজের ধান্ধায় চারদিকে ঘুরে বেড়ায় বলে লোকটার মুখখানা এতদিন ভাল করে দেখাই হয়নি। আজই প্রথম জানা গেল ধান্ধাটা ওর নিজের জন্য নয়।

রঞ্জু চুপ করে আছে দেখে একটা শ্বাস ফেলে কৃষ্ণদয়াল বলল, বোসবাবু বলছিলেন তোমাদের লাভই হবে। প্রায় দু'কাঠার মত জায়গা আছে বোধহয় এখানে, পুরো বারোশ' স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট পাবে ফার্স্ট ফ্লোরে, ফোর রুম, থ্রি বাথরুম। ইচ্ছে করলে দুটো আলাদা ছোট ফ্ল্যাটও নিতে পার। ক্যাশ টাকাও ভালই দেবেন, ব্ল্যাক চাইলে ব্ল্যাক, হোয়াইট চাইলে হোয়াইট।

রঞ্জু গম্ভীর মুখে বলল, তোমাকে তো কতদিন বলেছি, বড়দি রাজি হবে না।

কৃষ্ণদয়াল দমে গেল না, বলল, তুমি রাজি থাকলেই হল, রঞ্জু বাবু!

মানে?

তুমি রাজি থাকলেই তোমার ছোড়দি রাজি, আর দু'ভাই-বোনে মিলে বড়দিকে বোঝাতে আর কতক্ষণ?

কৃষ্ণদয়ালের নিশ্চিন্তভাব দেখে রঞ্জু অবাকই হল। প্রতিভা কি ধাতুতে গড়া সেটা ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অল্প বয়সে তন্ময়ের কাছ থেকে বড় একটা আঘাত পেয়েই বোধহয় ধীরে ধীরে পাল্টে গেছে প্রতিভা। খুব ছোট ছিল রঞ্জু তখন, তবু ওর মনে আছে সব। প্রতিভা কাঠ-কাঠ ব্যবহার করলেও, বড়দির জন্য গোপন একটা মায়া আছে রঞ্জুর।

কৃষ্ণদয়াল মানুষটা মনে হয় একটু অবুঝও আছে। ঘুরে ঘুরে ঠিক আসবে রঞ্জুর কাছে। অপমান গায়ে মাখে না। দালালদের বোধহয় এরকমই হতে হয়। বোস বাবুর হয়ে কাজ করছে অনেকদিন। এ পাড়ায় আসবার আগে খালের ওপারে ব্রহ্মপুরের দিকটায় কাজকর্ম করত। কোথায় কোন পুরনো বাড়ি কিংবা ফাঁকা জমি পড়ে আছে– তার কুষ্ঠি-ঠিকুজি লোকটার মুখস্থ। এঁটুলির মত লেগে থেকে থেকে সেসব বাড়ি-জমি বোস বাবুর হাতে তুলে দেয়াটাই ওর কাজ। পুরনো বাড়ি ভেঙে ঝা-চকচকে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে যাবে দুদ্দার।

তুমি একদিন নিজেই বল না বড়দিকে। রঞ্জু বলল।

ওরে ব্বাস! সে আমার সাহসে কুলোবে না, রঞ্জুবাবু!

মাথার ওপরে দু'হাত তুলে একটা ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করল কৃষ্ণদয়াল। প্রতিভার গম্ভীর চেহারা আর খিটখিটে মেজাজের জন্য পরিচিতরা একটু সমঝেই চলে ওকে, তবু কেন কে জানে রঞ্জুর বুকের ভেতরে বড়দির জন্য সেই গোপন মায়াটা ফিরে আসছিল। রঞ্জু যখন স্কুলে পড়ে তখন তন্ময় দার সঙ্গে বড়দিকে দু'একবার ঘুরতে দেখেছে। একদিন সন্ধ্যে বেলায় ইভনিংশো দেখে পদ্ম শ্রী হল থেকে বড়দি আর তন্ময় দাকে একসঙ্গে বেরোতেও দেখেছিল। সেদিন বুনো আর সুভাষ ছিল সঙ্গে। কী একটা বিশ্রী কথা বলেছিল বুনো, কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল রঞ্জুর। সুভাষ প্রতিবাদ করে বলেছিল, গুরুজনদের সম্বন্ধে বাজে কথা বলবি তো, আমাদের সঙ্গে মিশবি না, বুনো!

বুনো অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল, এই যে দেখ, নিজের কান নিজেই মুলে দিচ্ছি, গুরু! মাফ করে দে!

প্রতিভা যে ঠিক কবে সংসারের জোয়াল ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল সেটা বোধহয় সে নিজেও টের পায়নি। একদিন টপ করে বাবা চলে গেল। তারপর মা। তন্ময় দা কোথায় সটকে পড়ল কে জানে? এখানকার পাট তুলে দিয়ে বোধহয় সল্ট লেকের দিকেই চলে গেল। কোনও কারণ নেই, তবু ভাবতে গেলে বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা

জ্বালা করে ওঠে রঞ্জুর। যেন শুধু বড়দিকেই নয়, তাদের সকলকেই অপমান করে গেছে তন্ময় দা।

রঞ্জু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। চুপ করে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কৃষ্ণদয়াল পকেট থেকে বিড়ি বার করছিল, কথাটা আবার প্রথম থেকে শুরু করার জন্য বলল, চলবে নাকি, রঞ্জু বাবু?

রঞ্জু হাত বাড়াল। দেশলাই জ্বেলে খুব যত্ন করে প্রথমে রঞ্জুর বিড়িটা ধরিয়ে দিল কৃষ্ণদয়াল, তারপর নিজেরটা ধরিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা টান দিয়ে বলল, তুমি বলেই দেখ না একদিন। প্রথমেই কি আর বুঝতে চাইবেন? রোজই কথাটা বলবে, বলতে বলতে একদিন...।

কথার পিঠে রঞ্জু বলল, রাজি হয়ে যাবে বলছ?

খুব উৎসাহ নিয়ে কৃষ্ণদয়াল বলল, বাস্তব দিকটাও বোঝাতে হবে, বুঝলে? এসব পুরনো আমলের বাড়ি, আশির ওপর বয়স হবে, রেখেই বা কী হবে? মেনটেনেন্সও বোধহয় করা হয় না অনেকদিন, সে করতে গেলে যা লাগবে তাতে তোমাদের নতুন একখানা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। দেখো চিন্তা করে আমার কথাটা।

কৃষ্ণদয়াল উঠছিল, বলল, কাল-পরশুর মধ্যে একবার বাড়ি যেতে হবে, এসে ফের দেখা হবে।

রঞ্জু বলল, হঠাৎ বাড়ি?

চিন্তিতমুখে কৃষ্ণদয়াল বলল, আমার এক পুষ্যির খোকা হবে, তাকে হেলথসেন্টারের ডাক্তার বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছে। সিজার অপারেশন লাগবে নাকি বলেছে। যাই, গিয়ে তাকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করব।

ঠাট্টা করে রঞ্জু বলল, আমাকে নিয়ে যাচ্ছ কবে?

সে তোমার যখন খুশি যাবে। তবে আমাকে আগে থেকে বলে দিয়ো। পলাশির পরের ইস্টিশনে নেমে আমার নাম করলে যে কেউ পথ বলে দেবে। আমি নিজেও এসে ইস্টিশনে থাকতে পারি।

কৃষ্ণদয়াল বেরিয়ে যাচ্ছিল। আজও তাকে কোনও আশার বাণী শোনাতে পারেনি রঞ্জু।

ক'টা দিন কলেজে গেল না ঋতু। অঝোরে কাঁদল।

সারাক্ষণ শুয়ে রইল বিছানায়, খেলও না ভাল করে। ঘৃণায়-লজ্জায় দু'একবার আত্মহত্যার কথাও ভাবল। মায়ের সঙ্গে কথা বলল না একটাও। ফোলা চোখ দু'টি দেখে ঠিকে কি এসে জিজ্ঞেস করেছে, কী হয়েছে, দিদি ভাই? মায়ের সঙ্গে মনকষাকষি হয়েছে?

একে কি করে বোঝাবে ঋতু প্রবল এক ভূমিকম্পে তার সমস্ত বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে। আয়নায় নিজের মুখখানাও দেখতে ইচ্ছে করে না একবার। কী করবে সে এখন? যে মানুষটার নাম তার স্কুল-কলেজের সব সার্টিফিকেটে ছাপানো রয়েছে সে তার কেউ নয়। নিঃশব্দে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে ঋতু, দু'চোখের কোণ থেকে অনন্ত জলের ধারা বয়ে যায়।

নন্দিতাও চুপচাপ হয়ে গেছে খুব, মেয়ের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেনি একবারও। অভ্যাসবশত ভাত বেড়ে খাবার টেবিলে ডেকেছে, সাড়া না পেয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছে খাবার। বিকেলবেলায় গানের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিল বাইরের ঘরে। গানের দিকে মন নেই বলে সুর ভুল হয়ে যাচ্ছিল, তাল যাচ্ছিল কেটে। ছুটি করে দিয়ে এসে ভেতরের ঘরে বসেছে একা। মেয়ের মুখের দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে ওঠে, তবু নন্দিতার মনে হয়, একদিক দিয়ে ভালোই হলো। যে মিথ্যেকে সে এতদিন বয়ে বেড়িয়েছে, তার যাতনা থেকে তো সে মুক্ত! খুব স্বার্থপরের মতো লাগে, তবু সে এখন অনেক নির্ভার।

দিন যায়।

শীতের কুয়াশামোড়া দিনগুলো বয়ে যায়।

একদিন খুব ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে হঠাৎ একটা কোকিলের ডাক শুনতে পেল ঋতু। কী ছিলো সে ডাকে কে জানে, সব ভুলে গিয়ে ভেতরটা নেচে উঠলো ঋতুর। আর তক্ষুণি মনে পড়লো চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছে শীত, সামনে বসন্ত।

বাড়ির সামনেই পুকুরটার বাঁধানো পাড় ঘেঁষে পর পর কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। ক্লাবের ছেলেরাই বোধহয় লাগিয়েছিলো। আর ক'দিনের মধ্যেই ফুলে ফুলে লাল হয়ে যাবে গাছগুলো। চারদিকে রৌদ্রছায়ায় ভরা জীবনের আশ্চর্য কলরোল শুনতে পাচ্ছিলো ঋতু।

নন্দিতা শুয়ে ছিল, ঘুম ভাঙেনি এখনো। মশারির ভেতরে উঠে বসে খুব কাছ থেকে মায়ের মুখখানা দেখছিলো ঋতু। বোজ পাতার নিচে চোখের মণি দু'টি অল্প অল্প নড়ছিলো, চোখের চারদিকে গভীর ক্লান্তির ছাপ। ক'দিনেই যেন অনেক বুড়িয়ে গেছে মা। হঠাৎই যেন মায়ের জন্য দু'কূলপ্লাবি মায়া-ভালোবাসায় ঋতুর চোখ দু'টি ছলছল করে উঠলো। কী এসে যায় অমিতকিরণ যদি তার কেউ না হয়? হয় তো মুহূর্তের ভুল ছিলো, কিন্তু সেই ভুলই তো তাকে দিয়েছে এই জীবন। সামনে বসন্ত, বেঁচে থাকতে কী ভালো লাগছে আজ! বহুদিন পর মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিতে দিতে ঋতুর মনে হল।

সদ্য ঘুমভাঙা চোখে একটু বিস্ময় ফুটলো নন্দিতার। মেয়ের মাথায় খুব আলতো করে হাত রাখল সে।

॥ সাত ॥

দক্ষিণাপনে মধুসূদন মঞ্চের সামনে সিঁড়িতে বসেছিলো রঞ্জু। একা। এখন সন্ধ্যে আটটা বাজে প্রায়। এলোমেলো একটা হাওয়া দিচ্ছে আজ, অথচ আকাশ নির্মেঘ, পরিষ্কার। সোডিয়াম ভ্যাপার ল্যাম্পের ঝলমলে কমলা রঙের আলোয় উজ্জ্বল চারদিক। রোববার, ছুটির দিন বলে রাস্তায় ভিড় কম। একটা কি দু'টো বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি। মধুসূদন মঞ্চে বোধহয় কোনো বিখ্যাত দলের নাটক চলছে, দক্ষিণাপনের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক প্রাইভেট কার।

অন্যান্য দিন সন্ধ্যেবেলায় অনেক লোকই বসে থাকে এ জায়গাটায়। আজই তেমন লোকজন দেখা যাচ্ছে না। কয়েক ধাপ নিচে একটু দূরে একজোড়া যুবক-যুবতী খুব ঘন হয়ে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ কেনো যে ঋতুর কথা মনে পড়লো কে বলবে! চারদিকটা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলো রঞ্জু, কাছাকাছি কেউ নেই, যেন কেউ থাকলেই উঁকি দিয়ে দেখে নেবে তার মনের ভেতরটা। অসহ্য এই কলকাতা শহরটা থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবার কথা ভাবে রঞ্জু। কিন্তু কোথায় যাবে? কাল রাতে বাড়ি বয়ে এসে নির্মলদা বলে গেছে অনেক দরকারি কথা আছে, রঞ্জু যেন আজ অবশ্যই সন্ধ্যেবেলায় একবার দেখা করে। রঞ্জু জানে কী কথা। লোকসভার নির্বাচন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। পার্টি অফিসে এখন ঘন ঘন মিটিং হবে, সেসব মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হবে রেগুলার, তার ওপর রাত জেগে পোস্টারিং, ওয়ালিং। রঞ্জুর আর ভাল লাগছে না এসব। সকাল থেকেই আজকাল কী এক দুর্বোধ্য কারণে মন ভার হয়ে থাকে। দশটা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকে। সুখি এস মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, কী হল, ভাই? শরীর খারাপ? কপালে হাতে দিয়ে বলে গা তো ঠাণ্ডা দেখছি!

কী যে হয়েছে রঞ্জু কি নিজেই ছাই তা জানে! অনেকটা নির্মলকে এড়ানোর জন্যই আজ সন্ধ্যেবেলা থেকে সে এসে বসে আছে এখানে।

মধুসূদন মঞ্চের শো-টা ভেঙেছে। হাউস ফুল ছিল বোধ হয়। হই হই করে লোক নামছে সিঁড়ি দিয়ে। দলবদ্ধ সুখী মানুষ। নাটক সম্পর্কে দু' একটা টুকরো কথা কানে এসে লাগছিল। হঠাৎ এক মাঝবয়সি দম্পতির ওপর চোখ পড়তে চমকে উঠল রঞ্জু। বহুকাল আগে দেখা একটা মুখের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে মুখটা! কে? তন্ময়দা না? সঙ্গে ওই চন্দনরঙের তাঁত সিল্কের শাড়ি পরা মহিলাটি কি ওঁর বউ? পাশাপাশি বড়দির মুখখানাও মনে পড়ল

রঞ্জুর। ভদ্রমহিলা প্রতিভার থেকে ছোটোই হবেন, ঝকঝকে ফর্সা গায়ের রং, কপালে বেশ বড় একটা টিপ। পাশে তন্ময়দাকেই বরং একটু বেমানান লাগছে। মাথায় সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে টাক দেখা যাচ্ছে, কানের ওপর দুধারে কাঁচাপাকা। নেয়াপাতি ভুঁড়িখানাও বেশ প্রকট। বউটি প্রায় গায়ে লেপ্টে আছে তন্ময়দার।

নিচে নেমে বোধ হয় গাড়ি খুঁজছিল তন্ময়। হঠাৎ মাথার ভেতরে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল রঞ্জুর। ভিড় কাটিয়ে প্রায় ছুটে এসে তন্ময়ের সামনে দাঁড়াল, প্রায় চেঁচিয়েই বলল, তুমি তন্ময়দা না?

উদভ্রান্ত চেহারার রঞ্জুকে দেখে ঠিক চিনতে পারল না তন্ময়, একটু বোধ হয় অস্বস্তিতেও পড়ল, একটু আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে তো ভাই ঠিক...

আমি রঞ্জু! রঞ্জন ভট্টাচার্য!

রঞ্জুর চেহারা এবং হাবভাব দেখে ভয় পেয়েছে তন্ময়ের বউ, বরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বড় বড় চোখ করে রঞ্জুকে দেখছিল। প্রাইভেট কারগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে একে একে, ভিড় হালকা হয়ে আসছিল।

তন্ময় স্মৃতি হাতড়াচ্ছে, চিনতে পারছে না রঞ্জুকে। ব্যাপারটা যে ভান বুঝতে কষ্ট হয় না রঞ্জুর, নিষ্ঠুর হেসে বলে, আমি প্রতিভা ভট্টাচার্যের ছোট ভাই, সেই যে কানুনগোপাড়ায় আপনারা যখন ভাড়া থাকতেন... চকিতে একবার বউয়ের মুখখানা দেখে নিয়ে মাপা হাসে তন্ময়, ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে... ছোট ছিলে তখন তুমি, তাই চিনতে পারিনি... কী করছ এখন?

মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠছিল রঞ্জুর। বলল, কিছুই করছি না। বেকার।

অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে তন্ময় বলল, তোমার এক দিদি ছিল না, মুখে ভিটিলিগো ছিল? ভাল আছেন?

শ্বেতিরোগের ইংরিজী কি ভিটিলিগো? রঞ্জু ইংরিজীটা আগে কখনও শোনেনি। মাথার ভেতরটা দপ দপ করছে, দাঁতে দাঁত চেপে রঞ্জু বলল, হ্যাঁ, ভালই আছে। তন্ময়ের গাড়ি এসে থেমেছে পাশে।

তন্ময়ের বউ বোধ হয় ইশারা করেছে, ছোকরা বিহারী ড্রাইভারটা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা এক দৃষ্টিতে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে এখন। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা অনেকটা কমান্ডোদের মতো।

নার্ভাসনেস কাটানোর জন্য পকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরাল তন্ময়, তারপর এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, অনেক দিন যাওয়া হয় না ওদিকটায়, সময়ও পাই না।

রঞ্জু গম্ভীর গলায় বলল, আপনি কিন্তু বড়দির কথা একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, তন্ময়দা! ও আপনার কথা ভোলেনি এখনও। একটু মিইয়ে গিয়ে তন্ময় বলল, হ্যা, হ্যা, ভুলেই গেছিলাম জিজ্ঞেস করতে। ভাল আছে প্রতিভা?

তন্ময়ের বউ গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসেছে, আড়চোখে দেখে নিয়ে রঞ্জু বলল, ভাল আর কী করে থাকবে বলুন!

কেন? কোনও প্রবলেম হয়েছে বুঝি? এনি মিসহ্যাপ?

সেসব তো আপনিই ঘটিয়ে এসেছেন, দাদা!

রঞ্জুর চোখ দু'টি এখন জ্বলছে, কণ্ঠস্বরে বাঘের গর্জনের আভাস। কিছু একটা আঁচ করে গাড়ির দরজার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল তন্ময়, রঞ্জু শক্ত মুঠিতে তার বাহু ধরে ফেলল– চলে যাবেন না, স্যার! ভয়ের কিছু নেই। বড়দির লাইফটা কিন্তু আপনিই বরবাদ করে দিয়েছিলেন, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন সব?

হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল তন্ময়– কী সব আজেবাজে কথা বলছ? হাত ছাড়, নইলে পুলিশ ডাকব... ড্রাইভার!

বজ্রমুষ্টিতে ধরা হাত ছাঁড়িয়ে নেওয়া তন্ময়ের পক্ষে অসম্ভব। ভিড় কেটে গিয়ে জায়গাটা এখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, দু-চারজন ভিখিরি শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে রগড় দেখছিল।

তন্ময়ের ড্রাইভার ছুটে এসে রঞ্জুকে ছাড়াতে যাচ্ছিল, তলপেটে মারাত্মক একটা লাথি খেয়ে হাউমাউ করে মাটিতে বসে পড়ল সে। গাড়ির ভেতর থেকে তন্ময়ের বউ প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করেছে, ছাড় ন! ছাড় ন ওকে! ওগো, পুলিশ ডাকছ না কেন! ড্রাইভার...

পা দিয়ে ঠেলে গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিল রঞ্জু।

থর থর করে কাঁপছে তন্ময়, ভয়ে আতঙ্কে চোখদুটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন। দানবের শক্তি এখন রঞ্জুর গায়ে। ইচ্ছে করলে এ মুহূর্তে সে যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে পারে। হঠাৎ কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল, ছিঃ রঞ্জনদা, এ কী করছ? ওকে ছেড়ে দাও! আজ থেকে তুমি ভাল হয়ে যাও, প্লিজ!

আমূল চমকে উঠল রঞ্জু। চেনা কণ্ঠস্বর। চকিতে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখে নিল। না, তাকে দেখা গেল না কোথাও! ভুল শুনেছে সে। হঠাৎ নিজের ওপরই তীব্র ঘৃণা হল রঞ্জুর, তন্ময়ের হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, যাঃ শালা! ক্ষমা করে দিলাম! চোখের পলকে গাড়িতে উঠে পড়েছে তন্ময়, শব্দ করে দরজা বন্ধ করল। ড্রাইভার কঁকাতে কঁকাতে গিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে, তীর বেগে টার্ন নিয়ে গাড়িটা উঠে পড়ল ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপর।

॥ আট ॥

জীবনে এই প্রথম কলকাতা থেকে এত দূরে একা অচেনা একটা স্টেশনে এসে নামল রঞ্জু। এখন এই পড়ন্ত বিকেলে স্টেশনের ছোট্ট লাল বাড়িটা অদ্ভুত মায়াময় দেখাচ্ছে। আফ প্ল্যাটফর্মে কোনও শেড নেই, প্ল্যাটফর্মের ওপরেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। রঞ্জু এদিক-ওদিক তাকাল দু' চারজন হাটুরে মতো লোক নেমেছে, দেখেই বোঝা যায় এরা আনাজপাতি নিয়ে শিয়ালদায় নিত্য যাতায়াত করে। এই স্টেশনটার চারদিকেই বোধ হয় দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, আর কিছু চোখে পড়ে না। লোকগুলো গল্প করতে করতে মাঠের পথ ধরেছে।

রঞ্জুর পরনে ব্লু জিনস, গায়ে মেরুন রঙের টি-শার্ট, কাঁধের মাঝারি সাইজের রেক্সিনের ব্যাগে দু-চারটে জামাকাপড়, গামছা, পা-জামা, শেভিং সেট। ট্রেনটা হুইসেল দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর রঞ্জু দেখল আশেপাশে কেউ নেই। সে ছাড়া শুধু ডাউন প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটি ভিখিরি পরিবার। বাঁধানো বেঞ্চির ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এক বৃদ্ধ, একধারে কাঠকুটো জ্বেলে মেটে হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছে ভিখিরি গিন্নি, চারদিকে ছড়ানো তার হেঁসেলের রাজ্যপাট। জংধরা কৌটো, শিলজোড়া, ভাঙা প্লাস্টিকের মগ, বালতি, পরিত্যক্ত মিনারেল ওয়াটারের বোতল। গৃহকর্তা সম্ভবত কাজে বেরিয়ে গেছে। নোংরা কাঁথা-কাপড়ের স্তূপের ভেতর লুটোপুটি করছে কয়েকটি ন্যাংটো ছেলেমেয়ে। একটা পথের কুকুর বসে লেজ নাড়তে নাড়তে দৃশ্যটা দেখছিল। আশ্চার্য, ওরাও কেউ রঞ্জুকে লক্ষ্য করছে না।

বেরোবার সময় রঞ্জু দেখল টিকিট ঘরের ভেতরেও কেউ নেই। খুব শিগগির আর কোন ট্রেন নেই বলে এরা হয়তো স্টেশনের লাগোয়া রেল কোয়ার্টারস-এ গৃহকর্ম করতে চলে গেছে। ট্রেনের সময় হলে ফের আসবে।

স্টেশনের বাইরে সার দিয়ে কখানা ছিটে বেড়ার দোকানঘর, চায়ের দোকানটি বাদ দিয়ে আর সবই বন্ধ। ওপরে সাইনবোর্ড নেই। অন্য দোকানগুলো যে কিশের– সেটা বোঝার উপায় নেই। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে খুব, সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, খিদেও পেয়েছে অল্প। রঞ্জু চায়ের দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়লার উনুনে গনগনে আঁচ উঠেছে, তার ওপরে বসে দুই সসপ্যান আর একটা কেটলি। দুই সসপ্যানে দুধ আর চা ফুটছে। বাইরের কাঠের বেঞ্চিতে বসে দুই খদ্দের চাষবাস নিয়ে গল্প করছিল, ট্রানজিস্টরে রেডিও বাংলাদেশে চলছে, উদাত্ত গলায় ভাটিয়ালি–

আছেন আমার মোক্তার,

আছেন আমার ব্যারিস্টার,

শেষ বিচারের হাইকোর্টেতে

তিনি আমায় করবেন পার...

আমি পাপী, তিনি জামিনদার!

বেঞ্চির এক প্রান্তে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে রঞ্জু বলল, এক কাপ চা হবে?

লোকটার পরনে চেক লুঙ্গি, গায়ে হাতাওলা গেঞ্জি, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়স হবে, কবি নজরুলের মতো বাবরি চুল, নিচু হয়ে প্লাস্টিকের গামলা থেকে কাচের এঁটো চায়ের গ্লাস ধুয়ে তুলছিল। উঠে দাঁড়িয়ে একনজর রঞ্জুকে দেখেই বলল, কৃষ্ণ দয়ালের আশ্রমে যাওয়া হবে বোধ হয়?

অবাক হয়ে রঞ্জু বলল, হ্যাঁ কিন্তু...

বেটে কাচের গ্লাসে কেটলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে লোকটা বলল, এই অবেলায় এখেনে নেমেছেন যখন ওখানে ছাড়া আর যাবেনই বা কোথায়? ওর ওখানে ছাড়া তো থাকারও জায়গা নেই কাছাকাছি। কত কিসিমের লোক আসে ওর খোঁজে– ছেলে বুড়ো, ভিখিরি, নিকিরি, সধবা, বেধবা! ওর ঘাড় ভেঙে খেয়ে পালিয়েও যায় অনেকে, আবার পাকাপাকি থেকেও যায় কেউ কেউ। তবে আপনার মতো ভদ্রলোক কেউ কোন দিন ওর আশ্রমে এসেছে বলে মনে পড়ছে না।

রঞ্জু আর কথা বাড়াল না।

এই লোকটা জীবনে প্রথম বোধ হয় তাকে ভদ্রলোক বলল, কলকাতায় পাড়ার লোকেরা শুনলে কি ভিরমি খাবে? কৃষ্ণদয়াল লোকটার ওপরেও শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে রঞ্জুর। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে লোকটার কাছে থেকে ডিরেকশন জেনে নিল রঞ্জু, তারপর রেললাইনের ধার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ক্রোশ দুয়েক গিয়ে তালডাঙা পাওয়া যাবে, বেশ কতগুলো তালগাছ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে বাঁয়ে মেঠো পথ ধরে আরও ক্রোশ খানেক গেলে মুকুন্দপুর। খানিকটা এগোতেই চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল রঞ্জুর। দু' দিকে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ হলুদ হয়ে আছে সরষে ফুলে, হাওয়ায় তারই তেজি ঘ্রাণ। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। খাঁটি অক্সিজেন বুক ভরে টেনে নিতে নিতে রঞ্জুর মনে হল, কৃষ্ণদয়াল ঠিকই বলেছিল, এখানে সবই খাঁটি।

মুকুন্দপুর পৌঁছতে বিকেল ফুরিয়ে এল প্রায়।

গাঁয়ে ঢোকার মুখেই কালীবাড়ী, কালীবাড়ীর মাঠে টিউবওয়েল চেপে ঘড়ায় জল ভরছিল কয়েকটি বউ। রঞ্জু এগিয়ে গিয়ে বলল, কৃষ্ণদয়াল পালের বাড়ি কোন্ দিকে বলবেন?

লম্বা ঘোমটা টেনে অল্পবয়সী বউগুলো একধারে সরে দাঁড়াল, মাঝবয়সী একজন সামনে এসে বলল, কৃষ্ণদয়ালের আশ্রম? সে তো হু-উ-ই দিকে! আসুন আমিও যাব সেখানে।

ঘোমটার আড়াল থেকে অনেকগুলো কৌতূতলি চোখ তার দিকে চেয়ে আছে, সম্ভবত এই কচি বউগুলোও তাকে ভদ্রলোকই ভাবছে। ঘড়া কাঁখে একটু ভারী চেহারার মহিলাটি হেলতে-দুলতে চলেছে, পেছনে রঞ্জু। বাঁশ বাগানের ভেতর দিয়ে, ঢোলকলমির বন পেরিয়ে, পুকুরের পাড় ডিঙিয়ে, রথতলা উজিয়ে এসে রঞ্জু যেখানে এসে পৌঁছল, সেটা একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। শেষ বিকেলের আলোয় বাড়িটার ভগ্নদশা আরও প্রকট হয়েছে। পলেস্তরা খসে গেছে এখানে ওখানে। খিলান ভাঙা। চওড়া দালানে অনেকগুলো বাচ্চা ছোটাছুটি করছিল।

ভেতরবাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে মহিলাটি হাঁক দিল, ও কৃষ্ণদয়ালদা, তোমার নতুন অতিথি এসেছে। গো! দেখবে

এসো!

বিকেলের আলো ধীরে কমে আসছিল, চারদিকে ঘন হয়ে থাকা গাছপালার নিচে অল্প অল্প অন্ধকার জমছে। উঠোনের চারদিকে ঘিরে অনেকগুলো মেটে ঘর, মহিলার গলা পেয়ে হুড়মুড় করে সব বউঝি বাচ্চাবাচ্চা বেরিয়ে আসছিল। কৃষ্ণ দয়ালের বাড়িটাকে এতক্ষণ এরা কেন আশ্রম আশ্রম বলছিল সেটা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে রঞ্জুর কাছে।

দালানের কোনে কোথায় ছিল কৃষ্ণদয়াল, পরনে ধুতি, আদুল গা, ছুটে এসে রঞ্জুর হাতদুটি ধরে বলল, তোমাকে না খবর দিয়ে আসতে বলেছিলাম, রঞ্জু বাবু?

একটু হেসে রঞ্জু বলল, খবর না দিয়েও তো কোন অসুবিধে হয়নি! তোমার রাজ্যপাট দেখছি, সবাই চেনে এ অঞ্চলে!

আসলে এ জায়গায় তার আসা হবে সে কথা কাল রাতেও রঞ্জু জানত না। খবর দেবে কী করে? সকাল বেলায় নির্মল সেনগুপ্ত এসেছিল, ইলেকশনের কাজ করছে না বলে অনেকক্ষণ ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে গেছে, তারপর হঠাৎই এখানে চলে আসার কথা মাথায় আসে। ব্যাগ গুছোবার সময় সুখি এসে জিজ্ঞেস করতে শুধু বলেছিল, একটা কাজ পেয়েছি। সেখানেই চলে যাব। ছল ছল চোখে সুখি বলেছিল, সে কী! বলিসনি তো আগে? অফিসে বেরোবার মুখে প্রতিভা বলেছিল, কোথায় কাজ পেয়েছিস বলে যা! কতদূরে?

রঞ্জু বলেছিল, খুব দূরে নয়, আবার কাছেও নয়। বলে অনেকদিন পর শোজাশুজি বড়দির মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসেছিল রঞ্জু। চিন্তিতমুখে প্রতিভা অফিসে বেরিয়ে যাবার পর সুখিকে বলেছিল, চিন্তা করিস না, ছোড়দি। ভালই থাকব আমি।

কাছেই কোথাও বোধ হয় ছাতিম ফুল ফুটেছে, চড়া গন্ধটা হাওয়ায় ভাসছে। কৃষ্ণদয়াল বলল, এটা কিন্তু তোমার খুব অন্যায় কাজ হল, রঞ্জু বাবু! এই অবেলায় না জানিয়ে এলে, এখন তোমার আদরযত্ন করি কী করে বল?

সূর্য ডুবে গেছে একটু আগে, তবে আকাশে এখনও রাঙা আলো রয়েছে, সেই আলোয় উঠানে ভিড় করে থাকা মানুষগুলোকে দেখছিল রঞ্জু। তাকে ঘিরে অদ্ভুত একটা সাড়া পড়ে গেছে এখানে। বাড়িটায় ইলেকট্রিক আলো নেই, একটা দুটো করে লণ্ঠন জ্বলতে শুরু করেছে। বারবাড়ির গোয়ালে গোরুগুলো এইমাত্র ফিরেছে বোধ হয় মাঠ থেকে, তাদের ডাক শোনা যাচ্ছে। বাড়ির পেছনের পুকুর থেকে উঠে সারদিয়ে হাঁসগুলো ফিরছিল খাঁচায়।

হাত ধরে কৃষ্ণদয়াল দালানে নিয়ে এল রঞ্জুকে। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রেখে মেঝেতেই ধপ করে বসে পড়ল রঞ্জু। এরই মধ্যে একটি বউ এসে জলচৌকি, প্লাস্টিকের বালতিতে জল, মগ সব সাজিয়ে রেখে গেছে দালানের কোণে। হাতমুখ ধুয়ে এসে রঞ্জু দেখল ঘর থেকে মাদুর এনে দালানে বিছিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণদয়াল। বসতে না বসতেই কৃষ্ণদয়ালের এক পুষ্যি বউ এসে ধামাভর্তি মুড়ি রেখে গেল সামনে, সঙ্গে নারকেল কোরা। তারপর এল ডিম ভাজা আর চা। পাশে বসে গল্প করছিল কৃষ্ণদয়াল। উঠোনোর ভিড়ের ভেতর থেকে পাঁচ ছ বছরের একটি ন্যাংটো বাচ্চা ছুটে এসে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক গাল হেসে কৃষ্ণদয়াল বলল, এ আমার অনেক পুষ্যির একজন। নাতি বলতে পার। এদের নিয়েই আছি। চাষবাস আছে, মেয়েরা ঘরে ঘরে কিছু সেলাই-ফোঁড়াইও করে, হাওড়ার মঙ্গলা হাট থেকে কিছু অর্ডার এনে দিই। গতবার ব্যাংক লোন নিয়ে চারখানা সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছি। দু-বেলা জুটে যায়, আমার দালালির আয়টা ফাউ বলতে পার। জীবন জিনিসটা মন্দ লাগে না, বুঝলে, রঞ্জু বাবু! মনে মনে একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছে রঞ্জু– ঋতু, দারুণ একটা জায়গায় এসেছি আজ। জীবনে এই প্রথমবার এলাম, তবু কোন কিছুই অচেনা লাগছে না। মনে হচ্ছে গত জন্মে এখানেই আমি জীবন কাটিয়ে গেছি। খুব ইচ্ছে করছে তোমাকেও এখানে...

সন্ধ্যে না হতেই সামনের গাছগাছালির মাথায় প্রকাণ্ড এক চাঁদ উঠে পড়ল। আজ কি পূর্ণিমা? হবে হয়তো জ্যোৎস্নার ঝর্ণাধারা আকাশ থেকে গড়িয়ে নামছে পৃথিবীতে। বাড়ির পেছনে পুকুরপাড়ে একটা কুবো পাখি

হঠাৎ ডেকে উঠল– কুব! কুব!

রঞ্জুর গা শিরশির করে উঠল। না, এসব জিনিস বর্ণনা করবার ভাষা তার আয়ত্তে নেই। অসম্পূর্ণ চিঠিটা ভাঁজ করে মনের বুকপকেটে রেখে দিল সে।